অগস্ত্য-সংহিতা।

আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা সমেত

বাঙ্গালা গদ্যে

শ্রীরোহিণীনন্দন সরকার সঙ্কলিত

"যদি একদিনেই সিদ্ধ হইতে চাও এই অগস্ত্য সংহিতা পাঠ কর।"

— ঋষিবাক্য

কলিকাতা,

৫নং নীলমণি মিত্রের ষ্ট্রীট

ধর্ম্মযন্ত্রে

শ্রীচুনিলাল বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সন ১২৯৩ সাল।
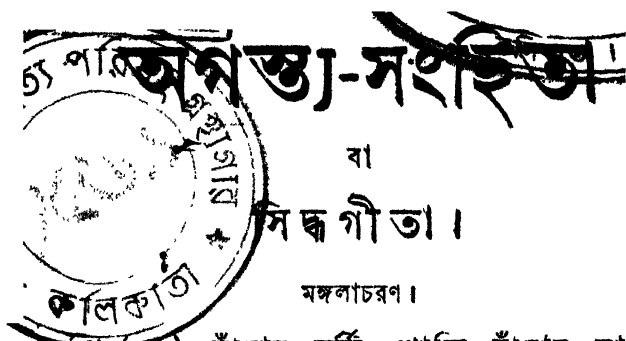
অগস্ত্য-সংহিতা

বা

সিদ্ধগীতা।

মঙ্গলাচরণ।

জ্যোতি (১) যাঁহার মূর্ত্তি, শান্তি যাঁহার ছায়া, সত্য যাঁহার মস্তক, ধর্ম্ম যাঁহার হস্ত, দয়া যাঁহার স্বভাব ও ক্ষমা যাঁহার প্রকৃতি, এবং পৃথিবী যাঁহার পদ, পাতাল যাঁহার পদতল ও স্বর্গ যাঁহার কটিতট, সেই শিবরূপিণী মহাশক্তিকে নমস্কার।

যিনি প্রাণের অভ্যন্তরে প্রাণ রূপে, হৃদয়ের অভ্যন্তরে হৃদয় রূপে, মনের অভ্যন্তরে মন রূপে এবং আত্মার অভ্যন্তরে আত্মা রূপে অবস্থানপূর্ব্বক যুগপৎ জ্ঞান, চৈতন্য, জীবন ও প্রকাশ বিধান করিয়া, নিরন্তর সংসার রক্ষা করিতেছেন এবং তজ্জন্য যিনি আমাদের পরম আরাধ্যা, সেই প্রকৃতিরূপিণী ভগবতী যোগমায়াকে নমস্কার।

উদ্বোধন।

অয়ি অজ্ঞানান্ধ বিষয়মত্ত জীব! তুমি আর কতকাল প্রমাদ-মদিরা পান করিয়া, মোহ-শয্যায় শয়ন করিয়া, অজ্ঞান-নিদ্রায় যাপন করিবে? জাগরিত হও—জাগরিত

(১) অর্থাৎ জ্ঞান।

হও। তোমার আর কালপ্রাপ্তির বিলম্ব নাই। তুমি বালক ছিলে, যুবা হইয়াছ, এবং যুবা ছিলে, বৃদ্ধ হইয়াছ। বৃদ্ধের পর আর তুমি কি হইবে?—কৃমি কীটে পরিণত হইবে, শ্মশান-প্রান্তরের ভস্ম হইবে, শৃগাল কুক্কুরের উদরস্থ হইবে, অথবা গৃধ্র গোমায়ুর বিবাদের বিষয় হইবে, না হয়, অনন্ত নরকের অধিবাসী হইবে! বিষয়ে মত্ত থাকিলে, পরমার্থ বিস্মৃত হইলে, এই রূপই শোচনীয় ও ঘৃণাবহ দশার শেষ দশা উপস্থিত হয়। অতএব বিষয়-পিপাসা ত্যাগ কর, এখনই যাইতে হইবে ভাবিয়া, বৈরাগ্য আশ্রয় কর এবং ধর্ম্মই পরলোকের সহায় ভাবিয়া, তাহাকেই অবলম্বন কর। আর কেন রোগে শোকে জীর্ণ হইতেছ? আর কেন পাপে তাপে জর্জ্জরিত হইতেছ? আর কেন মোহে ব্যামোহে নরকের কৃমি-কীটত্বে পরিণত হইতেছ? আর কেন বিষয় বিষয় করিয়া, তাপিত প্রাণ আরও তাপিত করিতেছ এবং জীর্ণ শীর্ণ মলিন হৃদয়কে আরও মলিন করিতেছ? ঐ দেখ, তোমার পাপে তোমার পরলোকের দ্বার রুদ্ধপ্রায় হইয়াছে এবং ইহলোকও এক বারেই ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। অতএব তোমার থাকিবার আর স্থান কৈ—বিশ্রাম করিবারও আর দেশ কৈ? অয়ি হত-প্রমত্ত-দগ্ধ জীব! তুমি কি চিরকালই এই রূপেই যাতায়াত করিয়া, অনন্ত ভ্রমি-যন্ত্রণা ভোগ করিবে? যদি যাতায়াত করিতে অভিলাষ না থাকে অথবা যদি নরকের কৃমি কীট হইতে ইচ্ছা না হয়, তাহা হইলে, এই সিদ্ধগীতা বা অগস্ত্য-সংহিতা আলোচনা কর, অভিপ্রেত সিদ্ধি লাভ করিবে।

গ্রন্থের বিষয় বা উদ্দেশ্য

সংসারে আত্মাই সার ও শ্রেষ্ঠ পদার্থ। বিষয় বল, বিভব বল, স্ত্রী বল, পুত্র বল, পিতা বল, মাতা বল, আর যাহাই বল, আত্মা অপেক্ষা প্রীতি ও মমতার পাত্র কেহ নাই। এই আত্মার জন্যই লোকে লোকের শত্রু বা মিত্র হইয়া থাকে এবং এই আত্মার জন্যই স্ত্রী পুত্রের প্রতি ও পিতা মাতার প্রতি পরম প্রীতি ও ভক্তি হইয়া থাকে। ইহার কারণ কি? এই অগস্ত্য-সংহিতা পাঠ করিলে, তাহা জানিতে পারা যায়। এইজন্য পণ্ডিতসমাজে এই সংহিতা দেহ-তত্ত্ব নামে পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহাতে তপঃসিদ্ধা উলূপীর (১) বিবিধ-হিতোপদেশপূর্ণ, জ্ঞানবিজ্ঞানসমন্বিত, পরম বিশুদ্ধ ও যুক্তিগর্ভ উপাখ্যান আছে, এইজন্য ইহার নাম সিদ্ধগীতা। ঐ উপাখ্যান পাঠ করিলে, সিদ্ধি বিষয়ে অনেক উপদেশ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ভগবতী দেবী পার্ব্বতী লোকানুগ্রহ-পরতার বশবর্ত্তিনী হইয়া, মহাভাগ ও মহাতপা অগস্ত্যকে যোগবিয়োগসমন্বিত (২) বহুবিধ তত্ত্ব উপদেশ করেন। এইজন্য ইহার নাম অগস্ত্য-সংহিতা।

(১) উলূপী চণ্ডালাদির ন্যায় নীচজাতীয়া রমণী। জীবনে অনেক গর্হিত অনুষ্ঠান করে। অনন্তর তপোবলে দেবী পার্ব্বতীকে সন্তুষ্ট করিয়া, সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। ইহার উপাখ্যান অতি আশ্চর্য্য। উহাতে কাব্য, নাটক ও নভেলাদির অংশ আছে। এইজন্য উহা সকলশ্রেণীরই পাঠ্য।

(২) যোগ শব্দে বিদ্যা ও বিয়োগ শব্দে অবিদ্যা। অথবা, যোগ অর্থাৎ ঈশ্বরপ্রাপ্তি, বিয়োগ অর্থাৎ সংসৃতি।

জীব!—হতভাগ্য, মোহাচ্ছন্ন, অন্ধ ও আত্মবিস্মৃত জীব। সংহারের দিন ক্রমশই নিকট হইতেছে। অতএব বৃথা কাযে আর বৃথা সময় নষ্ট করিও না। আত্মতত্ত্বের আলোচনায় প্রবৃত্ত হও এবং পরলোক-পদবী পরিষ্কৃত কর। ইহাই এই সংহিতার উপদেশ।

প্রথম পটল।

গ্রন্থারম্ভ।

ভুবন-কোষের উত্তরে সাক্ষাৎ পুণ্য-রাশির ন্যায়, কৈলাস নামে সর্ব্বভুবন-সুবিদিত ও সর্ব্বলোক-সমাদৃত মহাপর্ব্বত প্রতিষ্ঠিত আছে। যেখানে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্বর্গ বিরাজমান; সাম, যজু, ঋক্ ও অথর্ব্ব এই চতুর্ব্বেদ মূর্ত্তিমান্; সত্ব, রজ, তম ও চৈতন্য এই চতুর্গুণ শোভমান; শান্তি, বৈরাগ্য, উপশম ও উপরতি এই চতুর্ব্রহ্মসত্তা বিদ্যমান, এবং যেখানে জীবন্মুক্তির অধিষ্ঠান-বশতঃ আশা, ইচ্ছা, বাসনা ও স্পৃহা এই চতুর্বন্ধের নামমাত্রও শ্রূয়মাণ না হওয়াতে, সর্ব্বদাই পরম বিরাম বিরাজমান, সেই সর্ব্বশিব (১) শিবলোক ঐ কৈলাসপর্ব্বতের শিখর-দেশে সকল লোকের সাক্ষাৎ সিদ্ধির ন্যায়, প্রতিষ্ঠিত আছে। মহাভাগ মহর্ষি অগস্ত্য শান্তিলাভবাসনায় কোন সময়ে তথায় উপনীত হইলেন।

ত্রিলোকপাবনী জহ্নুনন্দিনীর পরমপবিত্র তটদেশে এই অগস্ত্যের স্বর্গাতিশায়ি-শোভা-বিভব-বিশিষ্ট, সর্ব্বাশ্রম-

(১) নিরবচ্ছিন্নমঙ্গলময়।

বরিষ্ঠ, দিব্য-বিচিত্র-পবিত্র-ভাব-সমাবিষ্ট, পরম অভীষ্ট ও শ্রেষ্ঠ আশ্রম বিরাজমান। তথায় প্রবেশ করিলে, স্বর্গে প্রবিষ্টের ন্যায়, আত্মার অনির্ব্বচনীয় প্রীতি উপজাত ও অমৃতহ্রদে নিমগ্নের ন্যায়, নির্ব্বাণ শান্তি সমাগত হয়। অথবা, যেখানে সর্ব্বনাশিনী বিষয়-পিপাসার নামমাত্র নাই, সেখানে শান্তি-সুখ আপনা হইতেই বিরাজমান, তাহা কি আর বলিতে হয়? বিষয়ে বিষ আছে ও অগ্নি আছে। এইজন্য বিষয়ীর জ্বালা যন্ত্রণার কোন কালেই অভাব নাই এবং মোহ-বিহ্বলতারও কোন কালেই বিচ্ছেদ হয় না। যেখানে বিষয়ের চর্চ্চা, সেই খানেই অশান্তি ও অবিরাম অবিরাম অবস্থিতি করে; যেখানে গহ্বর ও অন্ধকার, সেই খানেই সর্প ও বৃশ্চিকাদির অধিষ্ঠান, ইহা প্রত্যক্ষ-প্রমাণ-সিদ্ধ। যাহারা এই পাপ বিষয়ের দাস, তাহারা স্ব স্ব শরীর ও মনের অবস্থা সবিশেষ মনোনিবেশ সহকারে পর্য্যালোচনা করিলেই, বিষয়ের ভয়াবহতা, শোকাবহতা, ও তদনুরূপ অন্যান্য দোষাবহতা বুঝিতে পারে, অপরের উপদেশে আবশ্যকতা নাই। তপোবনে এই বিষয়ের কোনরূপ সম্পর্ক নাই। তজ্জন্য, কোনরূপ অশান্তি বা অবিরামেরও প্রচার বা প্রাদুর্ভাব নাই।

মহাভাগ মহর্ষি অগস্ত্য ঈদৃশ সর্ব্বলোকসুখাবহ, সর্ব্বকাল-রমণীয় ও সর্ব্বাবস্থা-সেবনীয় দিব্য শান্ত আশ্রমপদে উপবেশন করিয়া আছেন। তপস্বীর মন স্বভাবতঃ ধ্যাননিষ্ঠ ও লোকের উপকারেই বিনিবিষ্ট। যাহাদের সংসারে কোনরূপ স্পৃহা নাই, আমি বা আমার বলিয়া কোন-

প্রকার অভিমান বা অহঙ্কার নাই, তুমি বা তোমার বলিয়া কোনরূপ ভেদ বা বিশেষ জ্ঞান নাই; যাঁহারা নিশ্চয় জানিয়াছেন, পাপের ফল মৃত্যু ও মৃত্যুর ফল নরক এবং তজ্জন্য যাঁহারা স্বতঃ পরতঃ কায়-কর্ম্ম-মনঃ-কৃত পাপ হইতে অতি দূরে অবস্থান করিয়া, পরমার্থ-প্রাপ্তির প্রধানাঙ্গীভূত পুণ্যযোগের অনুষ্ঠান করেন, ঈশ্বরের ধ্যান ও লোকের নিঃস্বার্থ উপকারসাধন, এই দুইটীই তাঁহাদের একমাত্র অভীষ্ট বা সাধ্য বিষয় হইয়া থাকে। ইহা ভিন্ন তাঁহারা আর কিছুরই প্রত্যাশী নহেন। পণ্ডিতেরা বলেন, ঐরূপ প্রত্যাশাই প্রত্যাশার চরম সীমা। মহর্ষি অগস্ত্য এবম্বিধ-প্রত্যাশা-বিশিষ্ট। তিনি ভগবানের ধ্যান হইতে অবসর পাইলেই, কিসে লোকের উপকার হইবে, তদ্বিষয়ক ধ্যানে বিশিষ্টরূপ নিবিষ্ট হয়েন। তিনি জানেন, ঐরূপ ধ্যানই সাধুর লক্ষণ ও জীবন এবং উহাই পরমার্থের একমাত্র সাধন। তদ্ভিন্ন, অন্য কোন সাধন নাই। থাকিলেও, তাহা তাদৃশ প্রশস্ত বা সুখসেব্য নহে।

একদা তিনি ঐরূপ চিন্তা করিতেছেন, এমন সময়ে দিব্য দৃষ্টি সহকারে অবলোকন করিলেন, দুরত্যয় ও দুরভিভাব্য কালগতি প্রভাবে লোকের মতিগতি বিপরীত ও তৎসহকারে তাহাদের পরমায়ুরও পূর্ব্বাপেক্ষা ক্ষয় হইয়া আসিয়াছে এবং বল, বুদ্ধি, শক্তি, সামর্থ ও উৎসাহাদি পুরুষগুণ সকলও খর্ব্বীভূত হইয়াছে। কাহারও আর সে তেজ নাই, সে বীর্য্য নাই, সে ধৈর্য্য নাই, সে সাহস বা সে প্রকৃতি নাই। পাপের প্রভাববৃদ্ধি ও পুণ্যের প্রভাবহ্রাস হইয়াছে।

তজ্জন্য, মিথ্যা সত্যের আসন অধিকার ও অধর্ম্ম ধর্ম্মের পরাজয় সাধন করিয়াছে এবং তজ্জন্য শান্তির পরিবর্ত্তে অশান্তির উদয় হইয়াছে। এই রূপে লোকের সুখের দ্বার রুদ্ধ ও দুঃখের দ্বার বিস্তৃত এবং স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ ও নরকের দ্বার প্রশস্ত হইবার উপক্রম হইয়াছে। কাহারই আর সৎকার্য্যে শ্রদ্ধা নাই, সদ্‌বিষয়ে মতি নাই, সৎপথে গতি নাই এবং পরমার্থপথে প্রবৃত্তি নাই। ফলতঃ, যাহা ঘটিলে দুঃখের, অসুখের ও অশান্তির অভাব হয় না, প্রতিদিন প্রতিস্থলে তাহাই ঘটিতেছে এবং উত্তরোত্তর তাদৃশী ঘটনার বৃদ্ধি হইতেছে। লোকের আর কোন দিকেই ভদ্রস্থতা নাই। ক্ষুধা থাকিলে, হয় ত, আহার ঘটে না, আহার ঘটিলে, হয় ত ক্ষুধা থাকে না; সকলেরই প্রায় এইপ্রকার অবস্থা হইয়াছে। পুনশ্চ, শত দিকে শত রূপে অপায়ের দ্বারবৃদ্ধি ও উপায়ের দ্বার রুদ্ধ হইয়াছে।

মহর্ষি সহসা এই ঘটনা অবলোকন করিয়া, চকিত হইয়া উঠিলেন এবং মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, এইরূপ ঘটিবার কারণ কি? সে দিবস দেবী ভগবতী জিজ্ঞাসা করিলে, দেবদেব ভগবান্ পশুপতি যাহার কথা বলিয়াছিলেন, সেই সত্যধর্ম্মরূপ পূর্ণচন্দ্রের রাহু স্বরূপ এবং শান্তি ও নির্বৃতিরূপ কল্পমঞ্জরীর মহাবজ্র স্বরূপ, সাক্ষাৎ সংহারমূর্ত্তি কলিকালই, বোধ হয়, উপস্থিত হইয়াছে। তৎপ্রভাবেই লোকের বল বুদ্ধি, ধৈর্য্য শৌর্য্য ও জ্ঞান বিজ্ঞান ইত্যাদি দিন দিন ক্ষীণ হইতেছে। কাহারই আর কোন দিকে কোনরূপ মঙ্গল নাই। সেই কারণে বিদ্যার

আদরক্ষয় ও অবিদ্যার গৌরববৃদ্ধি হইতেছে, এবং সেই কারণেই মূর্খের নিকট পণ্ডিতের পরাজয় হইতেছে, ঠক্কুরের পরিবর্ত্তে কুক্কুরের আদর হইতেছে ও মহাচক্রের (শালগ্রামের) পরিহার পুরঃসর ক্ষুদ্র চক্রের (যাঁতা প্রভৃতির) পূজা হইতেছে। সেই কারণেই বালক বৃদ্ধ ও বৃদ্ধ বালক হইতেছে এবং সধবা বিধবা ও বিধবা সধবা হইতেছে! কি করিলে, এই সকল অত্যাচার ও উপদ্রবের নিবারণ হইতে পারে? অথবা, যিনি এই সৃষ্টি-সংহারের কর্ত্তা এবং এই ভয়াবহ কলি যাঁহার কালরূপের অন্যতর অবতার, সেই দেব-দেব ভগবান ভবানীপতিরই শরণাপন্ন হই। তিনিই ইহার উপায় বিধান করিবেন।

মহর্ষি এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, তৎক্ষণাৎ চলিতমনস্কের ন্যায়, গাত্রোত্থান করিলেন। তাঁহাকে গাত্রোত্থান করিতে দেখিয়া, সেই তপোবনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতারা তৎক্ষণে তথায় সমাগত হইলেন এবং সমুচিত-আশীর্ব্বাদসহকৃত নীরাজনাবিধি সমাহিত করিয়া, তাঁহাকে গমনে অনুমতি দিলেন। ঋষিও তাহাঁদের অনুজ্ঞাগ্রহণপূর্ব্বক শিষ্টাচারের অনুরোধে তপোবনবাসী প্রত্যেক তরু লতা, প্রত্যেক পশু পক্ষী ও প্রত্যেক কীট পতঙ্গ; ফলতঃ স্থাবর অস্থাবর সকল বস্তুকেই যথাযথ আমন্ত্রণ করিয়া, যোগবলে পক্ষীর ন্যায়, অবলীলাক্রমে আকাশে উত্থিত হইলেন, এবং দ্রুতবেগে শূন্যভরে কৈলাসাভিমুখে গমন করিতে লাগিলেন। তাঁহার শরীরে অনবরত সুনির্ম্মল, সুকোমল ও পরমভাস্বর ব্রহ্মতেজঃ সমুত্থিত হইতেছে। অতিদূর আকাশে উত্থিত

হওয়াতে, একটী মাত্র সূক্ষ্ম তেজোরেখার ন্যায়, লক্ষিত হইতে লাগিলেন।

এই রূপে তিনি স্বীয় তেজে প্রজ্বলিত হইয়া, অপর সূর্য্যের ন্যায় বা অন্যতর তেজীয়ান গ্রহের ন্যায়, দশ দিক্ উদ্ভাসিত ও সুদূরবিসারী অসীম আকাশ যেন ব্যাপ্ত করিয়া, গমন করিতে আরম্ভ করিলে, বিমানচারীরা সসম্ভ্রমে, সভয়ে ও সসংরম্ভে কেহ গাত্রোত্থান, কেহ অনুগমন ও কেহ বা অন্য রূপে সভাজন করিয়া, তাঁহারে আপ্যায়িত করিল। পাছে ঋষির আতপতাপে কোনরূপ ক্লেশ হয়, এই ভয়ে সূর্য্যদেব চন্দ্রের ন্যায়, শীতল, সৌম্য ও স্নিগ্ধ কিরণ বিকিরণ করিয়া, তাঁহার পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন এবং সমীরণ ব্যজন-বাহবৎ মৃদু মন্দ শীতল মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, একান্ত অনুগত ভৃত্যের ন্যায়, তাঁহার পথশ্রম-বিনিবর্ত্তনে প্রবৃত্ত হইলেন। ইহারই নাম তপস্যার অলৌকিক প্রভাব।

মহর্ষি এই প্রকারে শূন্যভরে গমন করিয়া, অনতিচির-সময়মধ্যেই কৈলাসপর্ব্বতে গমন করিলেন। দেখিলেন, প্রকৃতি পুরুষের সান্নিধ্যবশতঃ কৈলাস পর্ব্বত মুর্ত্তিমান্ শান্তির স্থান হইয়াছে। একমাত্র সাত্বিক ভাবই তথায় বিরাজমান। তদ্দর্শনে মহর্ষির শরীর লোমাঞ্চিত ও আত্মা পরম পরিতৃপ্ত হইয়া উঠিল। লোকের মন যখন সত্যপথে ধাবমান হয়, তখন শান্তি ও নির্বৃতি স্বয়ংই তাহার পরিচর্য্যা করে। যেখানে সত্য ও ধর্ম্ম, সেইখানেই সর্ব্বোৎকর্ষ-সহকৃত শান্তি-সমৃদ্ধির অধিষ্ঠান। মনুষ্য-সংসারে সত্য

ধর্ম্মের প্রভাব নাই। তজ্জন্য অশান্তি ও অনির্ব্বৃতিরও অভাব নাই। বলিলে, অত্যুক্তি হয় না, মনুষ্যের গৃহে গৃহে যেন এই অশান্তি মৃত্যুর সহিত, বালক বালিকার ন্যায়, সর্ব্বদাই বিচরণ ও ক্রীড়া করিতেছে। ঋষি-সংসারে একমাত্র সত্য ও ধর্ম্ম বিরাজমান। এইজন্য মৃত্যু নাই, ভয় নাই ও অশান্তি নাই। মহাতপা মহর্ষি অগস্ত্য ইহার জাজ্বল্যমান নিদর্শন।

তিনি কৈলাস-পর্ব্বতের সর্ব্বলোকাতিশায়িনী অসীম শোভা-সমৃদ্ধি দর্শন করিয়া, নয়ন-মন পরিতৃপ্ত করিতে করিতে, যেখানে পরমা-প্রকৃতিরূপিণী ভগবতী পর্ব্বত-নন্দিনী আপনার অনুরূপা সহচারিণী জয়া ও বিজয়ার সহিত আসীনা হইয়া, নারদাদি ভক্তদিগকে বিবিধ অভিনব তত্ত্ব উপদেশ করিতেছেন, তথায় ধীর-পদ-সঞ্চারে, সবিশেষ সম্ভ্রম সহকারে ও অকৃত্রিম ভক্তি-শ্রদ্ধা-বিনয়ভরে সমাগত হইয়া, একান্ত অনুগত ও নিতান্ত বশম্বদ ভৃত্যের ও সেবকের ন্যায়, দেবীর পদপ্রান্তে দণ্ডবৎ প্রণাম করিলেন। অনন্তর সমবেত ভক্তদিগের সকলকেই যথাযোগ্য বন্দনাদি করিয়া, কৃতাঞ্জলিপুটে দেবীর কৃপাকটাক্ষ-লেশ-কামনায় এক পার্শ্বে কাষ্ঠপুত্তলিকাবৎ দণ্ডায়মান হইলেন। ভক্তি ও শ্রদ্ধা লোকের মনকে বাস্তবিকই এই আকাশ অপেক্ষা বিস্তৃত, এই পর্ব্বত অপেক্ষা উন্নত, এই অগ্নি অপেক্ষা প্রদীপিত, এই সূর্য্য অপেক্ষা তেজঃসমৃদ্ধি-সমন্বিত, এই চন্দ্র অপেক্ষা শান্ত-গুণে অলঙ্কৃত এবং এই পৃথিবী অপেক্ষা ক্ষমাসম্পদে বিভূষিত করে! মহাভাগ অগস্ত্য ইহার প্রমাণ।

তিনি সাক্ষাৎ ভক্তি ও শ্রদ্ধার ন্যায়, ঐ রূপে দণ্ডায়মান হইলে, ভগবতী পার্ব্বতী তৎকালোচিত প্রিয়-মধুর উদার বাক্যে তাঁহার সমস্ত শ্রম, সমস্ত ক্লম ও সমস্ত ভ্রম নিরাকৃত করিয়া, কহিতে লাগিলেন, বৎস! যেখানে গুণ, সেইখানেই আদর, অবেক্ষা ও পূজা। অতএব তোমার ন্যায়, গুণবান্ ব্যক্তি সর্ব্বদাই আমাদের আদরণীয়, অবেক্ষণীয় ও পূজনীয়। গুণ সাক্ষাৎ ঈশ্বরের অংশ। তদ্‌বিধায় গুণবান্ ব্যক্তি-মাত্রেই ঈশ্বরের বিভূতি। তোমাতে কোন গুণেরই অভাব নাই। সুতরাং, তুমিও ঈশ্বরের বিভূতি ও তজ্জন্য পরম-শ্রদ্ধাস্পদ। বলিতে কি, তোমার ন্যায়, গুণশালীর সভাজন জন্যই এই কৈলাসপর্ব্বতের সৃষ্টি। অতএব আপনার গৃহ মনে করিয়া, নিঃশঙ্কে ঐ আসনে উপবেশন-পূর্ব্বক এই অতিমহতী সারস্বত-সমিতি অলঙ্কৃত কর।

মহর্ষি অগস্ত্য দেবীর এবংবিধ উদার বাক্যে পরম অনুগৃহীত ও কৃতার্থ বোধ করিয়া, লজ্জিতের ন্যায়, আসন পরিগ্রহ করিলেন। লজ্জা বা অনৌদ্ধত্যই সাধুগণের ভূষণ। তিনি নিতান্ত শিষ্টের ন্যায়, একান্ত শান্তভাবে উপবেশন করিলে, ভগবতী পুনরায় তাঁহাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, বৎস! তুমি যে উদ্দেশে আসিয়াছ, আমি তাহা অবগত হইয়াছি। প্রার্থনা করি, তোমার উদ্দেশ্য আশু সফল হউক। বলিতে কি, পরের উপকার জন্যই সাধুর জীবন এবং পরের অপকার জন্যই অসাধুর জীবন। ইহাই সাধু ও অসাধুর ভেদ। নতুবা, সাধুরও হস্ত আছে, পদ আছে, আহার আছে, ক্ষুধা আছে; অসাধুরও তদ্বৎ সমস্তই আছে।

সুতরাং, একমাত্র কার্য্য দ্বারাই সাধু অসাধুর ভেদ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। অতএব প্রার্থনা করি, তোমার ন্যায়, সাধুগণের নিত্য অবতার ও প্রাদুর্ভাব হউক। তাহা হইলেই, পৃথিবীর উদ্ধারপথ পরিষ্কৃত ও অনতিদূর হইবে, সন্দেহ নাই।

পুনশ্চ, যেখানে সাধুতা বা সদ্বৃত্তি, সেইখানেই মুক্তি। ঐরূপ সদ্বৃত্তির নামই আদ্য প্রকৃতি। সাধুতা অর্থাৎ গুণের সমবায় এবং প্রকৃতি অর্থাৎ গুণের সমবায়। সুতরাং সাধুতা ও প্রকৃতি উভয়ই এক। এই সাধুতা অর্থাৎ প্রকৃতি হইতেই ক্ষমা আসিয়াছে, করুণা আসিয়াছে, শান্তি আসিয়াছে এবং ন্যায় আসিয়াছে; যাহাদের প্রভাবে ও সহায়তায় সংসারস্থিতি বিহিত হইতেছে।

দ্বিতীয় পটল।

উদ্ধারের উপায়।

অগস্ত্য কহিলেন, ভগবতি! অনন্য-সাধারণ ঐশী শক্তির সান্নিধ্য বশতঃ আপনার কিছুই অবিদিত নাই। আপনিই জননী রূপে সকলের প্রসব ও জনক রূপে সকলের উৎপাদন করেন, এবং আপনিই সেই পরম তেজঃ, যে তেজঃ আমাদের সকলের বুদ্ধি প্রেরণ করিয়া থাকে, এবং যে তেজঃ সকলেই ধ্যান করে। আপনার অবিদিত নাই, বিপন্নের বিপদুদ্ধারই প্রকৃত সদনুষ্ঠান। আমরা যে তপস্যা করি, তাহার মুল বা মুখ্য উদ্দেশ্যও

বিপন্নের বিপদুদ্ধার। সংসারে নানাপ্রকার বিপদ আছে। যথা, ধননাশ, প্রাণনাশ, বন্ধুহানি, মনোহানি, এবং পিতা মাতা ও স্ত্রী পুত্রাদি প্রিয়বর্গের বিয়োগ ইত্যাদি। এই সকল বিপদকে লৌকিক বিপদ বলে। লৌকিক বিপদ তাদৃশ ভয়াবহ বা শোচনীয় নহে। কেন না, জন্মিলেই মরিতে হয় এবং ধন থাকিলেই, তাহার ক্ষয় হইয়া থাকে। যাহা ইন্দ্রজাল, তাহার বিনাশ অবশ্য হইবে। ধনাদিও ইন্দ্রজালের ও মায়া প্রভৃতির সম-পদ-বাচ্য। সুতরাং, তাহাদেরও বিনাশ অবশ্যম্ভাবী। তাহাতে আবার শোক কি ও বিপদ কি ?

ইত্যাদি বিবিধ কারণে ঐ সকল বিপদকে বিপদ বলিয়াই বোধ হয় না। ইহাদের মধ্যে একমাত্র পার-লৌকিক বিপদই প্রকৃত বিপদ। এই বিপদের নাম আত্মনাশ বা অধঃপাত। ইহা নিশ্চয়, মৃত্যুর পর স্বর্গ বা নরক এই দ্বিবিধ গতি হইয়া থাকে। তন্মধ্যে স্বর্গ-গতির নাম সাত্বিকী গতি এবং নারকী গতির নাম তামসী গতি। এই তামসী গতিই অধঃপাত বা আত্মনাশ শব্দে উল্লিখিত হয়।

মনীষিগণ বলিয়াছেন, আত্মার জয়-সমৃদ্ধি বা উত্তরো-ত্তর উন্নতি, অর্থাৎ স্বর্গের পর স্বর্গ ইত্যাদি, একান্ত প্রার্থনীয়। কেন না, আত্মা যে সে বস্তু নহেন, যে, তাঁহার প্রতি উপেক্ষা করিতে হইবে। কিন্তু দেবি ! যে ভয়ানক কাল উপস্থিত হইতেছে, তাহাতে, মনুষ্যের অধঃপাত বা আত্মনাশ একান্ত অবশ্যম্ভাবী ও অপরিহার্য্য,

সন্দেহ নাই। ইহা চিন্তা করিয়া, আমাদের অন্তঃকরণ অতিমাত্র অধীর ও আকুল ভাবাপন্ন হইয়াছে। কোন বিষয়েরই উপায় ও অপায় আপনার অবিদিত নাই। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক উপদেশ করুন, জীবের উদ্ধারের উপায় কি? দেখুন, দিন দিন মনুষ্যের বুদ্ধি বিদ্যা ও জ্ঞান প্রভৃতির সহিত পরমায়ুর ক্ষয় হইতেছে। কোন রূপে কোন দিকেই তাহাদের ভদ্রস্থতা নাই। তাহাদের স্বর্গদ্বার রুদ্ধ ও নরকের দ্বার বিস্তৃত হইয়াছে। আপনি ব্যতিরেকে আর কে তাহাদের নিস্তার করিবে?

দেবী কহিলেন, বৎস অগস্ত্য! তুমি উপযুক্ত প্রশ্ন করিয়াছ। তোমার ন্যায় সাধুহৃদয় পুরুষের এইরূপ প্রশ্নই শোভা পায়। লোকের মঙ্গলচেষ্টাই প্রকৃত তপস্যা। সেই মঙ্গল সাধনে তোমার কায়মন প্রবৃত্তি আছে। অতএব তুমিই প্রকৃত মহাপুরুষ। আমি তোমার প্রশ্নের যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করিব। অবধান কর।

সংসারে গৌণ ও মুখ্যভেদে নিস্তারের অনেক পন্থা বা অনেক উপায় বিহিত হইয়াছে। এই সকল উপায়ের মধ্যে কতক সাত্বিক, কতক রাজসিক ও কতক তামসিক এবং কতক বা মিশ্রিত অর্থাৎ সত্ব, রজ ও তম, এই তিনের সমবায়ে সুসিদ্ধ। তন্মধ্যে সাত্বিক পন্থাই প্রকৃত পন্থা। জ্ঞান এই সাত্বিক পন্থার মধ্যে অন্যতর। ফলতঃ জ্ঞানই নিস্তারের একমাত্র উপায়। অন্যান্য উপায় সহায়ে বহু কালে নিস্তার প্রাপ্ত হওয়া যায়। কিন্তু একমাত্র

জ্ঞানযোগ সহায় হইলে, নিস্তারপদবী, স্ব স্ব গৃহপ্রবেশ-পথের ন্যায়, একান্ত সুগম ও লোকমাত্রেরই আয়ত্ত হইয়া থাকে।

তৃতীয় পটল।

জ্ঞানস্বরূপনিরূপণ।

অগস্ত্য কহিলেন, দেবি! জ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ কি, যথাযথ বর্ণন করিয়া, আমারে অনুগৃহীত করুন। আপনার প্রভাবে ও প্রসাদে আমার অন্তর-তমঃ নিরাকৃত ও প্রবোধপ্রতিভা বিকশিত হউক। দেবি! যাহাদের প্রবোধ বা অন্তর্বিকাশ নাই এবং তজ্জন্য যাহারা চক্ষু থাকিতেও অন্ধ ও প্রাণ থাকিতেও জড়, কূপ-মণ্ডূকের সহিত তাহাদের বিশেষ নাই। বলিতে কি, এই সংসার ভয়াবহ অন্ধকূপ। মনুষ্যভেকাদি অসমর্থ প্রাণীর ন্যায়, তাহাতে পতিত হইয়া আছে, এবং যার পর নাই শোচনীয় দশা ভোগ করিতেছে। অতএব অনুগ্রহপূর্ব্বক তাহাদের উদ্ধারের উপায় কীর্ত্তন করিতে অনুমতি হউক।

দেবী কহিলেন, সকলে শ্রবণ কর, আমি জ্ঞানস্বরূপ কীর্ত্তন করিতেছি। যাহা দ্বারা জানিতে পারা যায়, তাহার নাম জ্ঞান। ইহাই জ্ঞানের প্রকৃত অর্থ। এখন বক্তব্য এই, কি জানিতে পারা যায়? সংসার? না। কেন না, যাহা কিছুই নহে, তাহা আবার জানা কি? আকাশ-

কুসুম নামে কোন পদার্থ নাই। সুতরাং তাহা জানা না জানা উভয়ই সমান। সংসার এই আকাশ-কুসুমের অন্যতর অর্থাৎ সর্ব্বৈব মিথ্যা। সুতরাং ইহাকেও জানা না জানা একই কথা। বস্তুর পর বস্তুর ক্ষয় হইতেছে, জীবের পর জীবের ধ্বংস হইতেছে এবং সংসারের পর সংসারের লয় হইতেছে। এই রূপে কত জীব, কত বস্তু ও কত সংসার আসিয়াছে ও যাইয়াছে, তাহার সংখ্যা নাই। অথবা, চিরকালই আসিতেছে ও যাইতেছে, যাহা যাইতেছে, তাহা আর দেখিতে পাই না। এই বস্তু এই, জানিতেছি। কিন্তু কালবশে আর তাহাকে দেখিতে পাই না। সে যখন যায়, তখন তাহার জ্ঞানও তাহার সঙ্গে, গমন করে।

ইত্যাদি বিচার দ্বারা ইহাই নির্দ্ধারিত হইল, যে, যাহা দ্বারা পরমার্থস্বরূপ আত্মাকে জানিতে পারা যায়, তাহারই নাম জ্ঞান। এই রূপ, সম্প্রদায়ভেদে জ্ঞানের বহুতর মীমাংসাও অর্থ আছে। আমি তোমার বোধ-বুদ্ধির নিমিত্ত যথা সংক্ষেপে তৎসমুদয় কীর্ত্তন করিতেছি, মনোযোগপূর্ব্বক শ্রবণ কর।

জ্ঞান দ্বিবিধ, সামান্য জ্ঞান ও বিশেষ জ্ঞান। আমি আছি, তুমি আছ, এই সমস্ত আছে, ইত্যাদি জ্ঞানের নাম সামান্য জ্ঞান। আর, আমি আছি, কিন্তু থাকিব না; তুমি আছ, কিন্তু থাকিবে না; ইত্যাদি জ্ঞানের নাম বিশেষ জ্ঞান। বিশেষ জ্ঞানে ঈশ্বরপ্রাপ্তি ও তৎসহকারে ভুক্তি-মুক্তি সংঘটিত হয়। আর, সামান্য জ্ঞানে সংসারসিদ্ধি ও

ক্রমশঃ তাহার বৃদ্ধি হইয়া থাকে। জীব যে সংসারে পুনঃ পুনঃ যাতায়াত করে, এবং যাবজ্জীবন স্ত্রী পুত্রাদি অসার পরিবারবর্গের পোষণ করিয়া, ভারবাহী বলীবর্দ্দাদির ন্যায়, ক্রমশঃ ক্ষীণ ও অবসন্ন হইয়া, চরমে ভয়াবহ মৃত্যু লাভ করে, বিশেষ জ্ঞান না থাকাই তাহার কারণ, এবিষয়ে কোনরূপ সংশয় নাই।

ইত্যাদি বিবিধ কারণে মনীষিগণ নির্দ্দেশ করেন, জ্ঞানই ব্রহ্ম। তথাহি, জ্ঞান প্রাপ্ত হইলেই, লোকের মুক্তি হইয়া থাকে; ঈশ্বর প্রাপ্ত হইলেও, মুক্তি হয়। সুতরাং, জ্ঞান ও ঈশ্বর উভয়ে বিশেষ নাই।

পুনশ্চ, কেহ কেহ বলেন, আত্মা ও পরমাত্মা অথবা জীব ও ঈশ্বর, ইহাঁরা পরস্পর অভিন্ন। যাহা দ্বারা ইহাঁদের এইপ্রকার অভেদ বুঝিতে পারিয়া, সমুদায় সংসার পরমাত্মাতে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহারই নাম জ্ঞান। সুতরাং, যাহা সর্ব্বস্বরূপ, তাহাই জ্ঞান এবং ঐ জ্ঞানই ব্রহ্ম।

যোগশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় সকলের যে সর্ব্বতোভাবে একতা, তাহারই নাম জ্ঞান। সুতরাং ঈশ্বরই জ্ঞান ও জ্ঞানই ঈশ্বর। সংসারে এমন ব্যক্তিই নাই, যাহার বুদ্ধি, মন ও ইন্দ্রিয় সকলের সর্ব্বতোমুখী একতা হইয়া থাকে। একমাত্র যোগবল সহায় না হইলে, ঐরূপ ঘটনা কোন মতেই সম্ভব নহে। সংসারে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, লোকের বুদ্ধি যদি স্থির হয়, মন স্থির হয় না এবং মন যদি স্থির হয়, ইন্দ্রিয়-

গণ স্থির হয় না। কদাচিৎ ক্বচিত এই তিন স্থির হইয়া, একত্র সমবেত বা মিলিত হইলে, তৎক্ষণাৎ পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা স্থির জানিও, ঐপ্রকার ক্ষণিক মিলনেও মহোপকার সাধিত হইয়া থাকে। অর্থাৎ তদ্দ্বারা আত্মার মলিনতা অনেকাংশে পরিহৃত ও পরমার্থ-মুখিতার সূত্রপাত সংঘটিত হয়। কালসহকারে ঐরূপ মিলন অভ্যস্ত হইলে, সিদ্ধিলাভ সহজ হইয়া উঠে। ঋষি-গণ ইহার দৃষ্টান্ত। সংসারে অনেক সময়ে অনেকে যে বিবিধ আশ্চর্য্য ও অভিনব বিষয়ের আবিষ্কার বা উদ্ভাবন করে, বুদ্ধি প্রভৃতির ঐরূপ মিলন হইতেই তাহার আবির্ভাব হইয়া থাকে।

কুম্ভকার যে ঘট নির্ম্মাণ করে, প্রধানতঃ জল, তেজ ও মৃত্তিকা এই তিনের সমবায়ই তাহার কারণ। সেই রূপ, সংসারের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট বিষয়, তৎসমস্তই প্রায় এই মন, বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়গণের সমবায় হইতে আবির্ভূত হইয়া থাকে। মনুষ্যের মন এক দিকে, বুদ্ধি অন্য দিকে ও ইন্দ্রিয়গণ আর এক দিকে। সেইজন্য, তাহার কোন কার্য্যই সিদ্ধ হয় না। সিদ্ধ হইলেও, তাহার স্থায়ি-ফল-ভোগ হয় না।

উপনিষদ্‌বিদ্যায় উল্লিখিত হইয়াছে, অনভিমান, অনহং-কার, অনাসক্তি, অদম্ভ, অহিংসা, আত্মসংযম, ঋজুতা, আচার্য্যের উপাসনা, ক্ষমা, শৌচ, স্থৈর্য্য, জন্ম মৃত্যু ও জরা প্রভৃতির দোষানুসন্ধান, স্ত্রী পুত্র ও গৃহাদিতে আসক্তিত্যাগ, ইষ্টানিষ্ট বা প্রিয়াপ্রিয়ে সমান জ্ঞান,

ঈশ্বরে ঐকান্তিক ও অকৃত্রিম ভক্তি, অধ্যাত্মজ্ঞান-নিত্যতা ও তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন, ইত্যাদির নাম জ্ঞান; তদিতর অজ্ঞান শব্দের বাচ্য।

জ্ঞানের ত্রিবিধ অবস্থা; উত্তম, মধ্যম ও অধম। ব্রহ্মাদি-স্থাবরান্ত সমুদায় ভূতে একমাত্র নির্বিকার পরমাত্মা বিরাজ করিতেছেন। তিনি বিরাজ না করিলে, কিছুরই প্রকাশ বা সত্তা-প্রতীতি হইত না। মহাপ্রলয়ে তিনি যখন আত্মায় আত্মাকে সংহৃত করিয়া, যোগমায়ার অনুসরণ করেন, তখন কিছুরই প্রকাশ থাকে না। একমাত্র অন্ধকার বা শূন্যেরই আবির্ভাব হইয়া থাকে। যে জ্ঞানের সহায়তায় উল্লিখিত রূপে পরমাত্মার আলোচনা করিতে পারা যায়, তাহার নাম উত্তম জ্ঞান। এই জ্ঞানের অপর নাম সাত্বিক জ্ঞান বা বিশিষ্ট জ্ঞান। সাত্বিক জ্ঞানই মুক্তিলাভের হেতু এবং স্বর্গাদি অভিমত বিষয়প্রাপ্তির সেতু।

যে জ্ঞানের অধীন হইলে, ভেদবুদ্ধির আবির্ভাব বশতঃ, আমি তুমি বা আমার তোমার, ইত্যাকর অহঙ্কার, অভিমান ও মমতা প্রভৃতির প্রচার ও প্রসার হইয়া, বন্ধের পর বন্ধ সংঘটিত করে, তাহার নাম মধ্যম জ্ঞান। এই মধ্যম জ্ঞান ঈশ্বর ও জগৎ এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী ব্যবধান স্বরূপ। অর্থাৎ এই জ্ঞানে জগৎ আছে, ইহাই কেবল লক্ষ্য হয়। অথবা, ঈশ্বরও আছেন এবং জগৎও আছে, এইপ্রকার বোধসিদ্ধি হইয়া থাকে। সেইজন্য, মধ্যম জ্ঞানে মুক্তিপ্রাপ্তি নিতান্ত সহজ নহে; বরং অনেক সময় অসাধ্যই হইয়া থাকে।

যাহার কোনরূপ উপপত্তি নাই, অর্থাৎ যে জ্ঞানের দ্বারা ঈশ্বর বা জগৎ কোন বিষয়েরই কোনপ্রকার মীমাংসা হইবার সম্ভাবনা নাই, তাদৃশ তত্ত্বার্থবিহীন সামান্য জ্ঞানকেই অধম বা তামস জ্ঞান কহে। বালকের জ্ঞান তামস জ্ঞান এবং পশুগণেরও জ্ঞান তামস বা নিকৃষ্ট জ্ঞান। এই নিকৃষ্ট জ্ঞানে আত্মার ও পরের ব্যাঘাত করিয়া, বিবিধ পরিণামহীন অসৎ অনুষ্ঠানের সৎ বোধে সম্পাদন হইয়া থাকে; যেমন, হস্ত পদাদির ছেদন, চক্ষু কর্ণাদির উৎপাটন, মারণ, উচাটন, বশীকরণ ও অন্যান্য আভিচারিকী দুরন্ত ক্রিয়াকলাপ। চোর চুরি করিতে গেল, তাহার উদ্দেশ্য কিছু পাইব। কিন্তু পরিণাম কি হইবে, বধ হইবে কি বন্ধন হইবে অথবা তৎসদৃশ অন্য কোনরূপ বিসদৃশ ঘটনা হইবে, তাহার স্থিরতা নাই। ইহারই নাম অধম বা তামস জ্ঞানের দৃষ্টান্ত। এই তামস জ্ঞান মনুষ্যকে ভূত প্রেতের ন্যায়, নিতান্ত হেয় ও সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুর ন্যায়, একান্ত ভয়াবহ করে। তখন আর তাহাতে বস্তু থাকে না, এবং আত্মা থাকে না। তখন সে আত্মাকেও হত্যা করিতে সঙ্কুচিত হয় না। তাহার পরলোকভয় তিরোহিত হয়। তন্নিবন্ধন সে পশুর ন্যায়, কার্য্যাকার্য্য-বিচারবিহীন হইয়া থাকে। এই রূপ, তাহার ইহলোক-প্রীতিও পরাহত হয়। এইজন্য, মত্তের ন্যায়, তাহার হিতাহিতবোধ বিদূরিত হইয়া থাকে।

বৈরাগ্য, বিবেক ও বিজ্ঞান এই তিনটী জ্ঞানের কার্য্য। যে জ্ঞানে আনন্দের যোগ হইলে, ব্রহ্মপ্রাপ্তি রূপ

চরম অভীষ্ট সিদ্ধ হয়, তাহার নাম জ্ঞানের বিজ্ঞান ক্রিয়া।

কেহ কেহ বলেন, ঈশ্বর কারণ ও জগৎ কার্য্য, ইহা যাহা দ্বারা জানা যায়, তাহার নাম জ্ঞান। এই জ্ঞান যখন ভজনানন্দসহযোগে সমুৎপন্ন হইয়া, ঈশ্বরের মহিমাদি-সমালোচনপূর্ব্বক তাঁহার স্বরূপপরিজ্ঞানে সমর্থ হয়, তখন তাহাকে পারমার্থিক বিজ্ঞানযোগ কহিয়া থাকে। বিজ্ঞানযোগের চরম ফল নির্বাণ মুক্তি।

চতুর্থ পটল।

প্রেমস্বরূপনিরূপণ।

অগস্ত্য কহিলেন, দেবি! আপনার বিতরিত এই অসুলভ বা দেবদুর্লভ উপদেশামৃত পান করিয়া, আমার অন্তরাত্মা পরম পরিতৃপ্ত হইল। বুঝিলাম, জ্ঞানই নিস্তারের উপায়। মনুষ্যের মধ্যে কলিযুগে যে ব্যক্তি জ্ঞানবান্ হইবে, তাহারই নিস্তারপ্রাপ্তি হইবে, সন্দেহ নাই। অধুনা আনন্দের স্বরূপ কীর্ত্তন করিয়া, আমারে কৃতার্থ করুন।

দেবী কহিলেন, এই আনন্দের অন্যতর নাম প্রেম বা বৈষ্ণবী প্রীতি অথবা সাত্ত্বিকী শক্তি। প্রেমের স্বরূপ কীর্ত্তন করিলেই, আনন্দের স্বরূপ বুঝিতে পারিবে। অতএব প্রেমের প্রকৃত ব্যাখ্যা করিতেছি, শ্রবণ কর। (১)

---

(১) উপদেশ অপেক্ষা দৃষ্টান্ত বলবান্। এইজন্য প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যাইতেছে, যে, নবদ্বীপের প্রেমাবতার গৌরাঙ্গ প্রভু এই চিন্তাময় প্রেমমূর্ত্তির অবতার। যাঁহারা তাঁহাকে না দেখিয়াছেন, শুদ্ধ শুনিয়াছেন বা পাঠ

করিয়াছেন, ভাবিয়া দেখিবেন, তিনি এইরূপ মধুর স্নিগ্ধ নির্ম্মল সুন্দর রূপে হৃদয়ে আবির্ভূত হয়েন কি না? পৌর্ণমাসী নিশীথিনীতে ভগবান্ কুমুদিনীনায়ক পূর্ণ ষোল কলায় সমুদিত হইলে, তাঁহার অমৃতময়ী সুকোমল কিরণমালা জলে স্থলে সর্ব্বত্র তপ্তকাঞ্চনপ্রবাহের ন্যায়, প্রতিফলিত হইয়া জগন্মণ্ডলের যেরূপ অপূর্ব্ব শোভা সমুদ্ভাবন করে, অতিবিশুদ্ধ স্বর্গীয় প্রেমের অক্ষয় উৎস স্বরূপ ভক্তবল্লভ গৌরাঙ্গের আবির্ভাবে তৎকালে ততোঽধিক শোভাসমৃদ্ধির প্রকাশ হইয়াছিল। তাঁহার পদ্ম-কুমুদ-শশাঙ্ক-শোভন বিচিত্র বদনমণ্ডলে হৃদয়স্থিত প্রগাঢ় প্রেমের যে নিরুপম-মধুরিমা-সহকৃত অমানুষ বিস্রম্ভ বিরাজমান ছিল, তাহা, মন্ত্রের ন্যায়, ইন্দ্রজালের ন্যায়, সকলেরই বশীকরণ সম্পাদন করিত! আহা, প্রভুর সুকোমল নয়নযুগলে অতিবিকসিত সুস্নিগ্ধ কমল অপেক্ষাও যে ভুবনমোহন সৌকুমার্য্য সর্ব্বকাল অবস্থিতি করিত, তাহা সাক্ষাৎ সৌভাগ্যের ন্যায় অথবা মূর্ত্তিমান্ দেবপ্রসাদের ন্যায়, শত্রু মিত্র সকলেরই অকৃত্রিম প্রীতি আকর্ষণ করিত! তিনি এরূপ সুন্দর ও প্রিয়দর্শন ছিলেন যে, দর্শনমাত্র ইচ্ছা হইত যে, তাঁহাকে শরীরান্তর্ব্বর্ত্তী হৃদয়াবকাশে প্রিয়তম প্রতিমার ন্যায়, ভক্তিভরে স্থাপনপূর্ব্বক যোগসমাধি সহকারে তদীয় সুকোমল পাদপল্লবের সর্ব্বদা পূজা করি। প্রণয়ের আধার, প্রীতির উৎস, প্রেমের সাগর, ভক্তির আগার, বিস্রম্ভের নিকেতন, মমতার আস্পদ, এবং আত্মীয়তার জন্মভূমি স্বরূপ তাদৃশী সর্ব্বলোকপ্রলোভনময়ী, সর্ব্বকাল-শোভাময়ী ও সর্ব্বদেশপ্রকাশময়ী অতিবিচিত্র প্রিয়মূর্ত্তি মর্ত্তলোকের সামগ্রী হইতে পারে না। তাঁহার বাক্য সকল সাক্ষাৎ প্রত্যাদেশ বা দৈববাণীর ন্যায়, সাধু অসাধু সকলেরই হৃদয়ে অগাধ প্রেম ও বিচিত্র ভক্তির আবির্ভাব করিত। তাঁহার সহবাস সাক্ষাৎ স্বর্গবাসের ন্যায়, ব্যক্তিমাত্রেরই স্পৃহণীয় ছিল। তাঁহার আচার ব্যবহার এবং রীতি চরিত্র সর্ব্বলোকচরিত্রের আদর্শ ছিল। তাঁহাতে ধর্ম্ম সত্য শান্তি প্রভৃতির সাক্ষাৎ আদেশ স্বরূপ যে অমানুষী পবিত্রতা, অদৃষ্টপূর্ব্ব নিষ্কপটতা ও অশ্রুতগোচর সরলতা বিরাজমান ছিল, স্বয়ং ভগবান্ ভিন্ন কুত্রাপি তাহার সদ্ভাব-সম্ভাবনা নাই। তিনি যাহা বলিতেন, তাহাই সাক্ষাৎ বেদ; যাহা করিতেন, তাহাই সাক্ষাৎ ক্রিয়াযোগ; যাহা ভাবিতেন, তাহাই, সাক্ষাৎ

ধ্যান; যে পথে চলিতেন, তাহাই সাক্ষাৎ পন্থা; যেখানে থাকিতেন, তাহাই সাক্ষাৎ স্বর্গ; এবং যেখানে স্নান করিতেন, তাহাই সাক্ষাৎ তীর্থসরোবর। তিনি কখন কোনরূপ ইন্দ্রজালাদি প্রদর্শন করেন নাই, তথাপি সকলকেই মোহিত করিয়াছিলেন; কখন কোনরূপ মায়াদি প্রকাশ করেন নাই, তথাপি সকলকেই বশীকৃত করিয়াছিলেন; কখন কোনরূপ মন্ত্রাদি চালনা করেন নাই, তথাপি সকলেরই হৃদয় আত্মসাৎ করিয়াছিলেন এবং কখন কোনরূপ দিব্যৌষধাদি বিস্তার করেন নাই, তথাপি সকলকেই স্ববশে আনয়ন করিয়াছিলেন। তিনি বৈদ্য ছিলেন না, তথাপি সহবাসীর, সহচারী ও অনুগতাদি লোকমাত্রকেই নীরোগ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং কল্পবৃক্ষ ছিলেন না, তথাপি শত শত ব্যক্তিকে অভীষ্ট ফল দান করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং জল ছিলেন না, তথাপি কত শত লোকের তৃষ্ণা নিবারণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং ভিক্ষুক ছিলেন, তথাপি সহস্র সহস্র লোককে ভিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং কৌপীনমাত্র পরিধান করিতেন, তথাপি শত শত ব্যক্তিকে বস্ত্র দান করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং নিরন্ন ছিলেন, তথাপি রাশি রাশি অন্ন বিতরণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ং দরিদ্র ছিলেন, তথাপি শত শত ব্যক্তিকে ধনী করিয়াছিলেন। তিনি কুটীরে থাকিয়াও যেন প্রাসাদে থাকিতেন, বল্কল পরিয়াও যেন দুকূল পরিতেন, দূর্ব্বায় শয়ন করিয়াও যেন অপূর্ব্ব শয্যায় নিদ্রা যাইতেন। তিনি যখন বহির্গত হইতেন, তখন গ্রাম হইতে গ্রাম, নগর হইতে নগর যেন ভয়াবহ স্রোতোবশে তাঁহার অনুগামী হইত। তিনি বালক, যুবা ও বৃদ্ধ সকলেরই সমান প্রণয়স্পাদ, সঙ্গী ও বয়স্য ছিলেন। ধনী দরিদ্র, শত্রু মিত্র, সকলেই তাঁহার সমানভাবে পূজা করিত। তিনি অগ্নির ন্যায় তেজস্বী ছিলেন, আবার জলের ন্যায় শীতল ছিলেন। আবার, তাঁহার তেজঃ ও শৈত্য সকলেরই সহ্য হইত। তিনি ফলভারাক্রান্ত বৃক্ষের ন্যায় নত ছিলেন, আবার প্রস্তরময় পর্ব্বতের ন্যায় উন্নত ছিলেন। আবার, তাঁহার এই অবনতি ও উন্নতিতে কেহ তাঁহার ধর্ষণ বা অনধিগমন করিতে পারিত না। তিনি সমুদ্রের ন্যায় অগাধ ছিলেন, কিন্তু কখন কুলহীন ছিলেন না। প্রত্যুত, কুলহীন লোকে তাঁহার আশ্রয়মাত্রে কুল প্রাপ্ত হইত। পুরাণে লিখিত

পিপাসায় জলপান করিলে, ক্ষুধায় আহার করিলে, শ্রান্তিতে বিশ্রাম করিলে, এবং রোগের সময় সুপথ্য সেবন করিলে, যেরূপ তৃপ্তি ও শান্তিলাভ হয়, সেইরূপ প্রেমের উদয়ে শান্তি ও তৃপ্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

আত্মার অব্যাঘাতে সমস্ত সংসারের আত্মীয় হইতে উপদেশ করা, এবং সেই চরাচরগুরু আত্মপতি ভগবানে অকৃত্রিম প্রীতি স্থাপন ও তাঁহার অভিমত কার্য্য সাধন করা প্রেমের লক্ষণ। উষার উদয়ে দিনমুখের যে রাগ প্রাদু-

আছে, ভগবান্ কার্ত্তিকেয় তারকাসুরসংহারজন্য কৃতসংকল্প হইলে, দেবগণ যাঁহার যে শক্তি, তাঁহাকে তাহা প্রদান করিয়াছিলেন। সেই রূপ, পরমপ্রভু গৌরাঙ্গ পাষণ্ডরূপ তারকাসুর দমন পূর্ব্বক সংসারে স্বস্বরূপ ভগবদ্ভাব স্থাপন করিয়া, ইহার উদ্ধারার্থ অবতীর্ণ হইলে, পৃথিবী তাঁহাকে সর্ব্বসহিষ্ণুতা প্রদান করেন। এই রূপ, আকাশ তাঁহাকে সকলের আধার অনন্ত বিস্তৃতি, অগ্নি তাঁহাকে সকলের সেবনীয় তেজ, বায়ু তাঁহাকে সকলের তৃপ্তিকর সুখসেব্যতা, এবং জল তাঁহাকে সকলের উপকারিণী শীতলতা, দান করিয়াছিল। এতদ্ভিন্ন, সরিৎপতি তাঁহাকে অগাধ গাম্ভীর্য্য, পর্ব্বত অসীম উন্নতি, তরঙ্গিণী অকৃত্রিম প্রশস্ততা, এবং অরণ্যানী তাঁহাকে অলৌকিক উদারতা প্রদান করিয়াছিল। পক্ষপাতশূন্য যথার্থ প্রেমিক চিত্তে বিচার করিলে, দেবতা ভিন্ন একাধারে এরূপ গুণরাশি দর্শন হওয়া সম্ভব হয় না। তিনি নবদ্বীপসাগরে প্রেমের চন্দ্ররূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া, সদ্ভাবরূপ যে বিচিত্র কৌমুদীলীলা বিস্তার করেন, তাহা প্রলয়েও নির্ব্বাণ হইবে, কি না, সন্দেহ। তিনি সাক্ষাৎ সত্য ও ধর্ম্মরূপে আবির্ভূত হইয়া, যে অকৃত্রিম-ভ্রাতৃভাব-সহকৃত অকৃত্রিম প্রেমবৈচিত্র্য উপদেশ করিয়াছেন, তাহা অভ্যাস করিলে, বিনা আয়াসে সিদ্ধিলাভ হয়, তদ্বিষয়ে অণুমাত্র সংশয় নাই। তিনি লীলাচলে যে লীলাবিস্তার করেন, লীলাচলের লীলাসংবরণ হইলেও, তাহার লয় হইবে, কি না, সন্দেহ। হরি! হরি!!

ভূ্ত হয়, প্রেমের উদয়ে হৃদয়ের ততোধিক স্ফূর্ত্তি সমুদ্ভূত হইয়া থাকে।

বুদ্ধির মলিনতা দূর করিয়া, কাচাদির ন্যায়, তাহার স্বচ্ছতা ও মসৃণতা সম্পাদন করা, হৃদয়ের যাহা কিছু অসদ্‌ভাব, তৎসমস্ত নিরস্ত করিয়া, বংশাদির ন্যায়, তাহার সরলতাদি সমাধান করা, আত্মাকে আকাশের ন্যায় পরিষ্কৃত ও প্রশস্ত করিয়া, পরমাত্মায় অভিমুখীন করা, নদী প্রভৃতির ন্যায় পরোপকার-ব্রত-নিত্যতার অভ্যাস করা, ইত্যাদি প্রেমের স্বভাব।

প্রেম হইতে সংসারে জ্যোতিঃ আসিয়াছে, কান্তি আসিয়াছে, দীপ্তি ও প্রদীপ্তি আসিয়াছে, অগ্নি ও জল এবং উন্নতি ও নতি উভয়ই আসিয়াছে; অথবা প্রতিভা ও আলোক, প্রকাশ ও বিকাস সকলই আসিয়াছে।

প্রেম, ভগবৎপাদপদ্ম হইতে বিনিঃসৃত প্রধান ও প্রথম ভাগীরথী; স্বয়ং ভাগীরথীরও পবিত্রতা সাধন করিয়াছে।

প্রেম স্বর্গের কল্পতরু, ঋষিগণের তপস্যা, দেবরাজের বজ্র, স্কন্ধের শক্তি, ভগবানের সুদর্শন, দেবগণের অমৃত, বিশ্বামিত্রের কামধেনু, সন্ন্যাসিগণের প্রব্রজ্যা, নারদের বীণা, গন্ধর্ব্বগণের স্বরলীলা, সরস্বতীর স্বাধিষ্ঠান পদ্ম, লক্ষ্মীর আশ্রয়, এবং স্বয়ং সমৃদ্ধিরও সমৃদ্ধি, ক্ষমারও ক্ষমা ও শান্তিরও শান্তি স্বরূপ।

এই প্রেমই সূর্য্যে আলোক দিয়াছে, চন্দ্রে কৌমুদী দিয়াছে, অগ্নিতে তেজঃ দিয়াছে, পৃথিবীতে সর্ব্বংসহতা দিয়াছে, আকাশে আধারতা দিয়াছে, সলিলে শৈত্য দিয়াছে,

কমলে কান্তি দিয়াছে, কুমুদে প্রতিভা দিয়াছে, পুষ্পে গন্ধ ও সৌকুমার্য্য দিয়াছে, এবং সতীর পাতিব্রত্য ও সাধুর সচ্চারিত্র্য সম্পাদন করিয়াছে।

মাধুর্য্য, ধৈর্য্য, বিনয়, সৌভাগ্য, সৌহার্দ্দ, ঋজুতা, মার্দ্দব, কোমলতা, সুশীলতা ইত্যাদি পৃথিবীর যাহা কিছু শোভা ও সমৃদ্ধি সাধন, তৎসমুদায় প্রেমের কার্য্য।

প্রেমে ভজনানন্দ উপস্থিত হয়, নির্ব্বাণমুক্তি সংসাধিত হয়, ভগবদ্ভাব সমাগত হয়, আত্মায় আত্মায় মিলন হয়, ব্রহ্মের অগম্য স্বরূপ অধিগম্য হয়, স্বর্গের পর স্বর্গ ও বৈকুণ্ঠের পর বৈকুণ্ঠ সংগঠিত হয়, আলোকের পর আলোক ও অভয়ের পর অভয় অবলোকিত হয়, যোগ ক্ষেমাদি সম্যক্ রূপে উপলব্ধ হয়, পুরুষার্থ ও পরমার্থের নিত্য দ্বার উদ্ঘাটিত হয় এবং নরক নরকের ন্যায় পাপ তাপ সমস্ত দূরীভূত হইয়া যায়।

বিষয়ে দোষদর্শন এই প্রেমের প্রথম শিক্ষা, তাহার পরিহার দ্বিতীয় শিক্ষা, বৈরাগ্য ও নির্ব্বেদ তৃতীয় শিক্ষা, মনের কষায় সমস্তের বিসর্জ্জন চতুর্থ শিক্ষা এবং আত্মায় আত্মার সংযোজনপূর্ব্বক বৈকারিক কার্য্য হইতে একবারে বিরত হওয়া তাহার চরম শিক্ষা।

ভীষ্ম এই প্রেমের উদয়ে ভগবানের বিচিত্র স্বরূপ উপলব্ধি করেন, প্রহ্লাদ স্তম্ভমধ্যে তাঁহার আবির্ভাব সাধন করেন, ধ্রুব কাননমধ্যে তাঁহাকে দর্শন করেন, দ্রৌপদী তাঁহাকে ক্রীতবৎ বশীকৃত করিয়া দুর্ব্বাসারও বিভীষিকা সমুদ্ভাবন করেন, রাজর্ষি অম্বরীষ তদীয় তেজে আবিষ্ট

হইয়া, ঋষিতেজঃও পরাহত করেন, গোপ ও গোপীগণ সাক্ষাৎ তাঁহাতে স্থান লাভ করেন, সরলমতি যশোদা একালে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড দর্শন করেন এবং বসুদেব ও দেবকী তাঁহাকে পুত্ররূপে প্রাপ্ত হয়েন। এই রূপে প্রেমের সাহায্যে কত ব্যক্তি কত রূপে অসাধ্য সকলও সাধন, অসম্ভব সকলও সম্ভাবিত এবং দুর্ঘট সকলও সংঘটিত করিয়াছে, তাহা বলা যায় না।

প্রেম ইন্দ্রজালের ন্যায়, অন্ধকারকেও আলোক করে, অগ্নিকেও জল করে, প্রস্তরকেও কর্দ্দম করে, উষরকেও উর্ব্বর করে, পতিতকেও উত্থিত করে, অধমকেও উত্তম করে, পাপকেও পুণ্য করে, সন্তাপকেও শান্তি করে, এবং পশুকেও মনুষ্য করিয়া থাকে। স্বর্ণে লোষ্ট্রে, সর্পে হারে, মিত্রে শত্রুতে, ভয়ে অভয়ে, মৃত্যুতে অমৃতে, ভীষণে মোহনে, সরলে বক্রে, কোমলে কঠিনে, সম্পদে বিপদে, হর্ষে বিষাদে, রোগে ভোগে, মানে দৈন্যে, অর্থে অনর্থে, বিয়োগে সংযোগে এবং শোকে সুখে সমদর্শিতাস্থাপন-পূর্ব্বক সর্ব্বথা সংসাররূপ সুদুষ্পার তমঃপারাবার অতিক্রম করিয়া, নিত্য পূর্ণ জ্যোতিঃপথে ভ্রমণ করিতে শক্তি সম্পাদন করা প্রেম ব্যতিরেকে আর কাহারও সাধ্য নাই।

প্রেমরূপ অপূর্ব্ব অঞ্জন-শলাকার সংযোগ হইলে, চক্ষুর যে বিচিত্র রূপাতিশয্য সমুৎপন্ন হয়, তদ্দ্বারা সর্ব্বত্র সেই মহানের মহান্, পরমের পরম ও অনাদিরও আদি অচিন্ত্যস্বরূপ ভগবান্‌কে সংসারের সর্ব্বত্র এবং সমস্ত সংসার সেই ভগবানে দর্শন করিয়া, ভূমানন্দ সম্ভোগ করিতে সমর্থ হওয়া যায়।

ফলতঃ, পাপ তাপ উপশমপূর্ব্বক, বিষাদ অবসাদ দূরীকরণপূর্ব্বক, সন্তাপ পরিতাপ নিরাকরণপূর্ব্বক, প্রাণ মন শীতল করিয়া, আত্মায় আত্মার যোগ করাই প্রেমের কার্য্য।

প্রেমলক্ষণা ভক্তি দ্বারাই পরমপুরুষকে প্রাপ্ত হওয়া যায়। উহাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ সাধন। যোগের প্রকৃত অর্থ, যদ্দ্বারা ঈশ্বরে যুক্ত হওয়া যায়। প্রেমলক্ষণ ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ যোগ আর কি আছে? অতএব পূরককুম্ভকাদি কতিপয় ক্রিয়াবিশেষ দ্বারা ঈশ্বরে মিলিত হইতে চেষ্টা করা আর শিরোবেষ্টনপূর্ব্বক নাসিকা স্পর্শ করা উভয়ই সমান। ঈশ্বরের কল্পিত উপায় থাকিতে, তদীয় সৃষ্ট বস্তুর কল্পিত উপায়ের অনুসরণ করা, মহাপ্রদীপ থাকিতে, ক্ষুদ্র প্রদীপের অর্থাৎ সূর্য্যের আলোক থাকিতে, প্রদীপের আলোকে কার্য্য করিতে যাওয়ার ন্যায়, বিড়ম্বনামাত্র। ঈশ্বর একমাত্র প্রেমের দাস। হৃদয়ে প্রেমের আবির্ভাব হইলেই, দপর্ণে প্রতিবিম্বের ন্যায়, তাঁহাকে তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাওয়া যায়। বিশেষতঃ, দোকানে যাইবার পথ যেমন সহজ, প্রেম ও ভক্তির পথ তাহা অপেক্ষাও সহজ। ব্যক্তিমাত্রেই বিনা আয়াসে এই পথের পান্থ হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহ নাই। আর, পূরক ও কুম্ভকাদি বহু আয়াসে বহু দিনে সাধ্য হয়, প্রেমভক্তি সেরূপ নহে। উহা মনে করিলেই যখন তখন যে সে রূপে সাধনা করা যায়। বিশেষতঃ, পূরকাদি যেরূপ কৃচ্ছ্রসাধ্য, তাহাতে সকল ব্যক্তির সিদ্ধি লাভ করা সহজ নহে। আর, যাহাদের তাহাতে

সিদ্ধিলাভ না হয়, তাহাদের কি ঈশ্বরে গতি হইবে না? ইহা কখনই যুক্তিসঙ্গত বা সম্ভব হইতে পারে না।

ফলতঃ, সদ্গুরুর নিকট প্রেম ও ভক্তি বিষয়ে সম্যক্রূপ শিক্ষিত হইয়া, ঈশ্বরে তাহা নিয়োগ করিলেই, সিদ্ধিলাভ অবশ্যম্ভাবী, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। কায়মনে ঈশ্বরের আনুগত্য করাই প্রেমের যথার্থ লক্ষণ। কায়মনশব্দে ঈশ্বরের কার্য্য করা, প্রীতি সাধন করা, মনন করা ইত্যাদি। ঐপ্রকার প্রীণন, মনন ও কার্য্যকরণ দ্বারাই আনুগত্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

তক্র, দধি ও নবনীতাদি যেমন দুগ্ধের বিকারমাত্র; তাহাদিগকে কল্পিত নামভেদে ও আকারভেদে দুগ্ধ বলিলেও অসঙ্গত হয় না, প্রেমপক্ষে পূরকাদিও তদ্রূপ। পূরকশব্দের অর্থ যাহা পূরণ করে। প্রেম অপেক্ষা পূরণ অর্থাৎ মনোরথ পূর্ণ করিতে অথবা শূন্য হৃদয় পূর্ণ করিতে আর কাহার ক্ষমতা আছে? রেচকশব্দে যাহা রেচন করে। প্রেম অপেক্ষা আন্তরিক মলাদি রেচন করিয়া, মনঃশুদ্ধি সাধন করিতে আর কাহারও ক্ষমতা নাই।

প্রেম ও ভক্তি সহায় থাকিলে, বিনা যোগে, বিনা তপস্যায় ঈশ্বরসিদ্ধিসংগ্রহ হইয়া থাকে। শাস্ত্র, যুক্তি সর্ব্বত্র ইহা প্রমাণিত হইয়াছে।

সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন অদ্বিতীয় ঈশ্বরই একমাত্র পরম গতি। তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে ও অবগত হইলে, সমুদায় প্রাপ্তব্য ও সমুদায় জ্ঞাতব্য লাভ হইয়া থাকে। পূর্ব্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে, সংসারের যাহা কিছু, তৎসমস্তই তিনি। তিনি

ভিন্ন আর কিছুই নাই। এইজন্য তাঁহাকে পরমাত্মা কহে। শ্রুতি প্রভৃতিতে তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, মনের মন, আত্মার আত্মা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেননা, প্রাণ, মন ও আত্মার যে কার্য্য, তিনিই তাহার প্রয়োজক। তিনি না থাকিলে, প্রাণ থাকিতে পারে না। সত্য বটে, চক্ষু দর্শন করে; কিন্তু সূর্য্যের কিরণসমষ্টি রূপ আলোক না থাকিলে, চক্ষুর দর্শনক্রিয়া প্রতিহত হয়। অতএব বিশেষ বিচার করিলে, আলোককেই চক্ষুর চক্ষু বলা যায়। এই-রূপ যুক্তিতে পর্য্যালোচনা করিয়াই, তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, মনের মন ইত্যাদি শব্দে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাতেই সমস্ত ক্রিয়া ও জ্ঞানের অন্তর্ভাব, এ কথা প্রতিপাদন করা বাহুল্য। যেমন নদী সকল সমুদ্রে মিলিত হইলে, আর তাহাদের মিলনস্থান নাই, অথবা যেমন ঘটাকাশ মহাকাশে একবারেই লয় পাইয়া থাকে, তদ্রূপ, সকল কার্য্যের ও সকল কারণের অবধি ঈশ্বরে যোগ হইলে, যোগ বিজ্ঞানাদির আর আবশ্যকতা কি? যাঁহাকে পাইবার জন্য উদ্যম করা যায়, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে, সেই উদ্যমের শেষ হইয়া থাকে, এ কথা কে না স্বীকার করিবে?

প্রকৃতির অন্যথাভাবকে বিকার বলে। এইজন্য রোগ শোকাদি বিকারপদের বাচ্য। বিকারমাত্রেই অধীরতা ও অশান্তির হেতু। এইপ্রকার বিকারহেতু উপস্থিত হইলে, যিনি বিকৃত না হয়েন, তাঁহাকেই ধীর ও শান্ত বলে। নির্ব্বিকারস্বরূপ ঈশ্বরে আত্মার যোগ হইলে, বিকারের কথা কি, তাহার কারণ সমস্তও ত্রিসীমায় যাইতে পারে

না। অগ্নিতে দাহিকা শক্তি আছে। উহাতে অনাবৃত হস্তাদি নিক্ষেপ করিলেই দগ্ধ হয়। কিন্তু জলমগ্নাদি হস্তের দাহ করা তাহার সাধ্য হয় না। সেইরূপ, বিকার সমস্ত সামান্য অগ্নিকণারূপ; ঈশ্বর স্বয়ং অগাধবারি মহাসাগরস্বরূপ। এই মহাসাগরে নিমগ্ন হইলে, সামান্য অগ্নিকণার সাধ্য কি, কেশমাত্রও স্পর্শ করে। এইজন্য ঈশ্বর-ভক্তের কোন কালে কোন দেশে কোনরূপ অশান্তি ও অধীরতা লক্ষিত হয় না। বায়ুশূন্য প্রদেশে প্রদীপ স্থাপিত হইলে, যেরূপ তাহার চঞ্চলতা দেখিতে পাওয়া যায় না, ঈশ্বরে যোজিত চিত্তের অধীরতা ও অশান্তি সেইরূপ অসম্ভব।

ফলতঃ, সূর্য্য হইতে যেমন সমুদায় তেজঃ পৃথিবীতে সঞ্চরিত হয়, সেইরূপ চৈতন্যের প্রদীপস্বরূপ ঈশ্বর হইতে চৈতন্য সমাগত হইয়া থাকে। প্রদীপ হইতে প্রদীপ যেমন প্রজ্বলিত হয়, চৈতন্যের সঞ্চার ক্রমশঃ সেইরূপ। বাহ্য ও আন্তর ভেদে চৈতন্য দুই প্রকার। তন্মধ্যে যাহা ভৌতিক জ্ঞানের হেতু, তাহাকে বাহ্য চৈতন্য এবং যাহা আন্তর জ্ঞানের কারণ, তাহাকে আন্তর চৈতন্য কহে। আন্তর চৈতন্যের নাম চিৎসত্তা। শরীরের কোন স্থানে আঘাতাদি করিলে যে, তৎসমকালেই বেদনাদি অনুভূত হয়, তাহাকে ভৌতিক জ্ঞান কহে। এই ভৌতিক জ্ঞান চিৎসত্তা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া, বাহ্য দেহের সর্ব্বত্র সন্নিহিত আছে। তাহাতেই স্পর্শাদির অনুভব হইয়া থাকে। অধিকন্তু, যাহাকে বিজ্ঞান বা

পরোক্ষ জ্ঞান কহে, আন্তর চৈতন্যের প্রধান কার্য্য তাহার সম্পাদন করা। চুম্বকের সহিত লৌহের যে সম্পর্ক, পরোক্ষরূপী ঈশ্বরের সহিত ঐ চৈতন্যের তদ্রূপ সম্পর্ক নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে। লৌহ সন্নিহিত হইলেই, চুম্বক তাহাকে আকর্ষণ করে, সেইরূপ, ভগবানের সান্নিধ্যযোগে উল্লিখিত চৈতন্য তাঁহাতে মিলিত হইয়া থাকে। তখন আর ভৌতিক জ্ঞানের নামমাত্র থাকে না। এই অবস্থায় সাধকের দেহ অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত, জলে নিমজ্জিত বা কর্ত্তরি-কাদি দ্বারা কর্ত্তিত হইলেও, জড়ের ন্যায়, তাহার বোধমাত্র থাকে না। ইহারই নাম যথার্থ প্রেম যোগ এবং ইহারই নাম বৈষ্ণবগতি। ঈশ্বরকে একমাত্র সত্য জানিয়া, আর সমস্তই নেতি নেতি বোধে ত্যাগ করিয়া, তাঁহাতে একাগ্র চিত্ত সন্নিহিত করিলেই, এই বৈষ্ণবগতি লাভ হইয়া থাকে। এইজন্য যোগশাস্ত্রের কথিত কৃচ্ছ্রসাধ্য আসন ও পূরকাদি করিবার আবশ্যকতা নাই।

বুদ্ধিশব্দে ষড়িন্দ্রিয়ে সঞ্চারিণী বৃত্তিবিশেষ। এই বৃত্তি দ্বারা ইন্দ্রিয়সকলের চালনা হয়। সুতরাং বুদ্ধিকে ইন্দ্রি-য়ের প্রভু বলিলেও অসঙ্গতি হয় না। বুদ্ধিকে মনের অংশচতুষ্টয়ের মধ্যে অন্যতর অংশ বলিয়া নির্দ্দেশ করিলেও উল্লিখিত যুক্তির বাধকতা হয় না। ফলতঃ, প্রভুর সহিত ভৃত্যের যে সম্বন্ধ, বুদ্ধির সহিত ইন্দ্রিয়গণের সেই প্রকার সম্বন্ধ। ' বুদ্ধি চঞ্চলতা পরিহার করিলে, ইন্দ্রিয়গণও স্ব স্ব বিষয়ে নিবৃত্ত হইয়া, বুদ্ধির অনুসরণ করে। ক্ষেত্রজ্ঞ শব্দে বুদ্ধির দ্রষ্টা বা সাক্ষী। বুদ্ধি এই ক্ষেত্রজ্ঞেরই

তত্ত্বাবধানকার্য্য করিয়া থাকে। ক্ষেত্রজ্ঞ সাক্ষিরূপে না থাকিলে, কর্ণধারহীন নৌকার ন্যায়, বুদ্ধির বিপন্নদশা উপস্থিত হয়। এইজন্য ক্ষেত্রজ্ঞকেও আত্মা কহে। ক্ষেত্রজ্ঞ যেমন বুদ্ধির সাক্ষী, আত্মা সেইরূপ ক্ষেত্রজ্ঞের সাক্ষী। এইজন্য আত্মাকে স্বতঃসিদ্ধজ্ঞানস্বরূপ কহিয়া থাকে এবং এইজন্যই আত্মার অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত ইহার একতাপ্রাপ্তির কোনপ্রকার অন্তরায় নাই। কর্দ্দমের সহিত কর্দ্দম অনায়াসেই মিলিত হইয়া থাকে। অগ্নিতে মৃত্তিকা ও ধাতু প্রভৃতি যে বস্তু নিক্ষিপ্ত হয়, তাহাই অগ্নির স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, এবং তাহারই মলিনতা দূর হইয়া যায়। এইজন্য বলিয়া থাকে, প্রেম থাকিলে মাটীও খাঁটি হইতে পারে। ফলতঃ, একমাত্র দুগ্ধে যেমন ক্ষীর নবনী প্রভৃতি বিবিধ দ্রব্যের বৈচিত্র্য, তদ্রূপ একমাত্র প্রেমে সদ্যোমুক্তি, ক্রমমুক্তি, জীবন্মুক্তি প্রভৃতি বিবিধ বৈচিত্র্য সন্নিবিষ্ট আছে। আমি আছি বা জগৎ আছে, এইপ্রকার বোধমাত্র পরিশূন্য হইয়া, তন্ময় হইতে পারিলে, অর্থাৎ আত্মায় আত্মা মিলিত করিয়া, পরমাত্মময় হইলে, সদ্যো-মুক্তিলাভ হয়।

সংসারের প্রতি যে প্রেম ও ভক্তি, সেই উভয়কে প্রত্যাহরণপূর্ব্বক, ভগবানে নিয়োগ করিতে পারিলেই সদ্যোমুক্তিপ্রাপ্তি হয়। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, পুত্রকে কিজন্য ভালবাসিতে ইচ্ছা হয়? উপাদেয় আহারদ্রব্যে কিজন্য অনুরাগ উপস্থিত হয়? ইত্যাদির হেতু কেবল আত্মার তৃপ্তি; অর্থাৎ পুত্রকে স্পর্শ করিলে হৃদয়ের সহিত

অঙ্গ শীতল হয় এবং উপাদেয় আহারীয়ে তৃপ্তিপূর্ব্বক ভক্ষণ দ্বারা উত্তমরূপে ক্ষুধায় শান্তি ও দেহপুষ্টি রূপ পরম অভীষ্টসিদ্ধি হয়। এই কারণে, তাহাতে অনুরাগসঞ্চার হইয়া থাকে। এক্ষণে ভাবিয়া দেখ, যিনি ঐ পুত্রাদির সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনি কতদূর অনুরাগাদির পাত্র। এই-প্রকার চিন্তা করিয়া, প্রথমে যদি না পার, অন্ততঃ পুত্র-বুদ্ধিতে সেই পুত্ররূপী পরমাত্মায় প্রেম স্থাপন করিবে। পরে, পুনঃ পুনঃ আলোচনা দ্বারা লৌকিক জ্ঞান দূরীভূত হইয়া, ঈশ্বরবুদ্ধি উপস্থিত হইলেই, অকৃত্রিম প্রেমের আবির্ভাব হইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। যাহারা কোন-প্রকার যোগ বা তপস্যা জানে না এবং তপোযোগ অবগত হইবারও যাহাদের ক্ষমতা নাই, তাহারা এই রূপেই সিদ্ধ হইয়া থাকে।

যাঁহারা প্রকৃত প্রেমপথের পান্থ, তাঁহারা অণিমা লঘিমাদি সিদ্ধি সমুদায়কে বিড়ম্বনা বলিয়া অগ্রাহ্য করেন। তাঁহাদের অভিপ্রায় এই, যখন ঈশ্বরে লীন হইলেই, সকল অভীষ্টের ও সকল সিদ্ধির শেষ হয়, তখন তৎসমস্ত আয়ত্ত করিবার জন্য আয়াস পাওয়া পণ্ডশ্রমমাত্র। স্বাস প্রশ্বাসাদি রুদ্ধ করিয়া, শরীর বায়ুপূর্ণ করিলে, তাহা আপনিই শূন্যভরে উত্থিত হইবে, ইহা সকলেই জানে। তাহাতে আবার পুরুষত্ব কি? যদি তাহাতে পুরুষত্ব আছে, স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, বায়ুভরে ঐরূপে শূন্যে উড্ডীয়-মান তৃণাদিরও পুরুষত্ব আছে, স্বীকার করিতে হইবে। সুতরাং, এই সকল পণ্ডক্রিয়ার অভ্যাস ও অনুষ্ঠানাদিতে

বৃথা সময় ব্যয় না করিয়া, প্রেমযোগের সাধন করিবে। কেন না, এই প্রেমযোগে সকল যোগের অন্তর্দ্ধান ও পর্য্যবসান আছে। প্রেমই যথার্থ বৈষ্ণবযোগ। মতি-ভেদে মানুষের রুচিভেদ হইতে পারে; অর্থাৎ কাহারও অম্লে, কাহারও মিষ্টে, কাহারও কটুকাদিতে, এই রূপে প্রত্যেক ব্যক্তির বিষয়ভেদে রুচিভেদের সম্ভাবনা। কিন্তু, পুত্রাদিকে অন্তরের সহিত প্রীতি করা, বোধ হয়, সর্ব্ব-বাদিসম্মত; এবিষয়ে যেমন কাহারও কোনপ্রকার দ্বৈধাপত্তি নাই, প্রেমও সেই রূপ সর্ব্ববাদিসম্মত সর্ব্বসিদ্ধি-যোগ, তাহাতে কাহারও দ্বিরুক্তি নাই। কেন না, এই প্রেমে পতন নাই, অবসাদ নাই, ক্ষয় নাই, খেদ নাই। ইহার স্বভাব উত্তরোত্তর উন্নতি। যোগাদিতে পতন ও অবসাদাদির সম্ভাবনা আছে। ইহা শাস্ত্রে ও লোকাদিতেও শ্রুত হইয়া থাকে। কিন্তু, ঈশ্বরপ্রেমে যদি পতন থাকে, তবে তাহা অশ্রুর; যদি ক্ষয় থাকে, তবে তাহা পাপের; যদি অবসাদ থাকে, তবে তাহা নরকের।

কার্য্য বলিলে, ক্ষয় বিনাশাদি বিকার বিশিষ্ট জাগতিক ব্যাপারপরম্পরার অনুভব হইয়া থাকে। বাস্তবিক সর্ব্বশক্তি পরমেশ্বরে যোগ হইলে, কার্য্যের সহিত আর কোন-প্রকার সম্পর্ক থাকে না। কেন না, কারণ হইতেই কার্য্যের উৎপত্তি হয়। ঘট ভাঙ্গিয়া গেলে, তন্মধ্যস্থ আকাশ মহাকাশে লীন হয়, এবং ঘটস্থ মৃত্তিকাও মৃত্তিকায় লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অধিকন্তু, তাহার জলীয় ও তেজোগত পরমাণুও স্বস্বরূপে পর্য্যবসিত হয়। এই

প্রকারে ঘটরূপ কার্য্যের চিহ্নমাত্রও অবশিষ্ট থাকে না। বেদান্তাদিমতে ইহারই নাম পঞ্চীকরণব্যবস্থা। প্রেমলক্ষণ ভক্তিযোগে ভগবানে লয় হইলে, উল্লিখিত পঞ্চীকরণ-ব্যবস্থায় কার্য্যাংশের নিঃশেষে লয় হয়। ভূতবাদিগণ এইপ্রকার পঞ্চীকরণব্যবস্থার প্রতিবাদ করিতে পারে।

এই ব্রহ্মাণ্ডের যে উপাদান, দেহেরও সেই উপাদান; ব্রহ্মাণ্ডের যে ধাতু বা প্রকৃতি, দেহেরও সেই ধাতু বা প্রকৃতি লক্ষিত হইয়া থাকে। কার্য্যাংশের চরমাংশ যে পরমাণু, তাহাতে দেহ ও ব্রহ্মাণ্ড উভয়েরই অন্তর্ভাব আছে। আবার, দেহত্যাগ হইলে, ব্রহ্মাণ্ডত্যাগ হয়। এই রূপে দেহ ও ব্রহ্মাণ্ড উভয়ই এক বস্তু। যেমন, দশ বলিলে, দশটী এক প্রতীত হয়, অতএব দশ হইতে এক বা এক হইতে দশ, বস্তুতঃ পৃথক্ নহে, তদ্রূপ ব্রহ্মাণ্ড দেহের সমষ্টিমাত্র। ভগবানে লীন হইলে, এই কার্য্যাংশ দেহের উপরতি হয়; অর্থাৎ এই দেহ প্রারব্ধবশে গমনাগমন করিলেও, কর্ত্তা তাহা জানিতে পারেন না। কেহ কেহ ইহাকে জীবন্মুক্তি বলে। যাহাই হউক, ইহারই নাম প্রকৃত প্রেমের অবস্থা। মদ্যপায়ী ও প্রেমিক, এ উভয়ের অবস্থাই সমান। মদ্যপায়ী যেমন পানবশে মত্ত হইয়া, আপনার শরীরস্থ বসনাদি স্খলিত হইলেও জানিতে পারে না; তদ্রূপ প্রেমিক পুরুষ ভগবানের সান্নিধ্যানন্দে মগ্ন ও নিমগ্ন হইয়া, আপনার দেহের ব্যাপারপরম্পরার অনুভব করিতে পারে না। উহা কেবল স্বভাব বা অভ্যাসবশে চালিত হইয়া থাকে।

আমি কে, কোথা হইতে আসিয়াছি, আমার অবসানই

বা কোথায়, ইত্যাকার বিচার করিলে, প্রথমতঃ ভূতাংশের, অনন্তর কালাংশের, তদনন্তর চৈতন্যাংশের অনুভব হইয়া, অহঙ্কারগ্রন্থির সর্ব্বথা ছেদন হইয়া থাকে। ঐপ্রকার ছেদনকেই আত্মজ্ঞানের পরিপাক কহে। আত্মজ্ঞানের পরিপাক হইলে, তত্ত্বমসি পদের সহিত প্রকৃত ব্রহ্মস্বরূপ পরিজ্ঞাত হইয়া থাকে। ঐপ্রকার পরিজ্ঞানই প্রেমের পরিপাকাবস্থা, নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভগবানের আনুগত্য করিতে অকৃত্রিম অভিলাষ উপস্থিত হইলে, আপনা হইতেই পরোক্ষবোধ সম্পন্ন হইয়া থাকে। এই পরোক্ষবোধ শরীরমধ্যবর্ত্তী বিজ্ঞানকোষে অনুপ্রবিষ্ট আছে। সূর্য্য হইতে যেমন কিরণ সকল প্রসূত হইয়া, সমস্ত সংসার আলোকিত করে, তদ্রূপ বিজ্ঞানকোষ হইতে জ্ঞানের প্রতিভা বিকীর্ণ হইয়া, পরমার্থ জগৎ প্রতিভাত করে। অবিদ্যা ও বিদ্যা লইয়া পরমার্থ জগতের রচনা হইয়াছে। তন্মধ্যে অবিদ্যাকে মায়া ও বিদ্যাকে জ্ঞান কহে। ভগবান পরমাত্মা যুগপৎ মায়া ও জ্ঞান উভয়ে জড়িত। এই মায়া প্রকৃতির নির্ম্মাণ এবং জ্ঞান তাহার নিরাস করিয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই ক্ষণবিনশ্বর জগৎকার্য্য নেতি নেতি বোধে দূরে পরিহার করিয়া, কবাট উদ্ঘাটনপূর্ব্বক গৃহমধ্যে প্রবেশের ন্যায়, ঐ মায়া ও জ্ঞানঘনতার উদ্ভাবন করত প্রকৃত রূপে সেই সর্ব্বশক্তি ঈশ্বরের পরমপদ অবলোকন করিতে সমর্থ, তিনিই ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া, সুদুষ্পার তমঃপারে গমনপূর্ব্বক সেই নিত্যজ্যোতি সম্ভোগ করিয়া থাকেন। ইচ্ছামৃত্যু ও কামস্বরূপত্ব ইত্যাদি ঐ জ্যোতিঃস্বরূপদর্শনের পরিণাম। যিনি

আত্মায় আত্মার দর্শনপূর্ব্বক সর্ব্বতোভাবে পরমাত্মময় হইতে পারেন, তাঁহার সকল ক্ষমতাই যে অধিকৃত হয়, ইহা প্রতিপাদন করা বাহুল্য। প্রকৃত যোগী পুরুষ যে ইহ লোকে থাকিয়াই সর্ব্বলোকে বিচরণ করিতে পারেন, ঐপ্রকার জ্যোতিঃস্বরূপের সাক্ষাৎকারই তাহার একমাত্র কারণ। প্রেমযোগসহায়ে আশু এই সকল সম্পন্ন হয়।

রূপের সাহায্যে যেমন রূপের দৃষ্টি হয়, তদ্রূপ স্বরূপের সাহায্যে স্বরূপের সাক্ষাৎ হইয়া থাকে, তাহাতে সন্দেহ কি? স্বরূপশব্দের অর্থ আত্মতত্ত্বের অবধারণা। আত্মার বহিত পরমাত্মার যে একতা আছে, তাহা পূর্ব্বেই প্রতিপাদিত হইয়াছে। স্নতরাং, আত্মার সাক্ষাৎকারে পরমাত্মার সাক্ষাৎ হইয়া থাকে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ পন্থা। প্রেমযোগ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে বুদ্ধির মালিন্যত্যাগ হইলে, এই সংসারের অনিত্যতাদি দোষ সমস্ত স্বতই প্রত্যক্ষ হইয়া থাকে। স্থির জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব দর্শন নিঃসন্দিগ্ধ, ইহা কে না স্বীকার করিবে। অথবা, আকাশ নির্ম্মেঘ হইলে, নক্ষত্র তারকাদির প্রকৃত স্বরূপ নয়নবিষয়ে পতিত হইয়া থাকে, ইহাও কাহারও অস্বীকার্য্য হইতে পারে না। সে যাহা হউক, বুদ্ধির কষায় দূর হইলে, জগতের অনিত্যতা যখন আপনা হইতেই প্রতিপাদিত হয়, তখন আর যোগীর চিত্তে ইহার কিছুমাত্র আকর্ষণ হইতে পারে না। তখন তিনি জীর্ণ পুরাণ বস্ত্রের ন্যায়, ইহলোক ত্যাগপূর্ব্বক সর্ব্বথা নিত্য সুখসম্ভোগে উৎসুক হইবেন, তাহাতে বিচিত্রতা কি? ঐপ্রকার নিত্যভোগকামনাই প্রেমযোগের পরিণাম বা

একমাত্র উদ্দেশ্য। বিজ্ঞান মতে ইহারই নাম উন্নতির পর উন্নতি।

রাজ্যের পর রাজ্য, বিষয়ের পর বিষয় সংগ্রহ করিলাম, তাহাতে হইল কি? পুত্রের পর পুত্র, কন্যার পর কন্যা উৎপাদন করিলাম, তাহাতে হইল কি? কীর্ত্তির পর পর কীর্ত্তি, যশের পর যশ সঞ্চয় করিলাম, তাহাতে হইল কি? প্রাসাদের পর প্রাসাদ, অট্টালিকার পর অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিলাম, তাহাতেই বা হইল কি? এইপ্রকার বারংবার অনুধাবনপূর্ব্বক সাবধান ও একাগ্র চিত্তে সবিশেষ বিচার করিলে, বিষয়ের কিছুমাত্র বৈচিত্র্য বা গৌরব থাকে না। তাহাতে মনে স্বভাবতঃ নির্ব্বেদজাড্য উপস্থিত হইয়া, কোন সারবস্তু অবলম্বনপূর্ব্বক, নির্ব্বৃত্তিলাভে অভিলাষ জন্মে। ইহাই প্রেমযোগধারণার প্রথম সোপান। যাঁহারা এই সোপানে অধিরূঢ় হয়েন, তাঁহাদিগকেই প্রকৃত যোগী বলে।

প্রেম হইতে ভক্তি, ভক্তি হইতে জ্ঞান, জ্ঞান হইতে মুক্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। পণ্ডিতেরা বৈরাগ্য ও উপাসনাকে জ্ঞানের নামান্তর বলিয়া কল্পনা করেন। তাঁহাদের মতে যে ব্যক্তি আতুর বা যাহার কোনপ্রকার ক্ষমতা নাই বলিয়া পুষ্প, চন্দন ও মন্ত্রোচ্চারণাদি সহকারে উপাসনা করিতে পারে না, তাহার কি উদ্ধার হইবে না? তাঁহারা বলেন, একমাত্র মন থাকিলে, ভাগবতী গতি লাভের কিছুমাত্র ব্যাঘাত হয় না। লোকে আতুর হইলেও, পুত্রাদির প্রতি মনে মনে (বাক্যে ও শরীরে না পারুক) যে রূপে প্রেমাদি

প্রদর্শন করে, পরমেশ্বরে সেইরূপে প্রেম প্রদর্শন করিলেই, তাহার উদ্ধারের পন্থা আবিষ্কৃত হইয়া থাকে। যিনি ঐপ্রকার অকৃত্রিম প্রেম প্রদর্শন করিতে সমর্থ, তিনিই প্রকৃত যোগী পুরুষ।

সংসারে সকল বিষয়েরই বিশেষ বিশেষ পরিণাম আছে। এই পরিণামকে কেহ চরম ফল, কেহ বা উদ্দেশ্য বলিয়া থাকে। কারণের পরিণাম কার্য্য, কার্য্যের পরিণাম ফলপ্রাপ্তি বা স্বার্থসংঘটন। এইপ্রকার পরিণাম হইতেই প্রবৃত্তি ও নিবৃত্তির সঞ্চার হইয়া থাকে। যাহার কিছুমাত্র জ্ঞান নাই, সেও পরিণাম না বুঝিলে, কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না। বিষয়সেবার পরিণাম ইন্দ্রিয়প্রীতি, বৈরাগ্যের পরিণাম মুক্তি পর্য্যন্ত, বস্তুমাত্রেই তৃণ জ্ঞান, জ্ঞানের পরিণাম আত্মপ্রাপ্তি, সন্তোষের পরিণাম সুখ, অর্থের পরিণাম কাম, কামের পরিণাম ভোগ, ভোগের পরিণাম দেহাদিপুষ্টি, এবং প্রেমের পরিণাম ঈশ্বরপ্রাপ্তি বা ভগবৎসিদ্ধি। এই রূপে ভগবান্ সর্ব্বভূতাত্মা বিশেষ বিশেষ কার্য্যের বিশেষ বিশেষ পরিণামবিধি স্থাপন করিয়া, পরম সুকৌশলে সংসারস্থিতি বিধান করিতেছেন। পরিণাম দ্বিবিধ, শুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ। তন্মধ্যে যাহাতে অভীষ্টসিদ্ধি হয়, তাহাকে শুদ্ধ পরিণাম এবং যাহাতে অনিষ্টাপত্তি হয়, তাহাকে অবিশুদ্ধ পরিণাম বলে। শাস্ত্রকারেরা এইপ্রকার ইষ্টানিষ্ট দর্শন করিয়া, শুদ্ধ ও অবিশুদ্ধ ভেদে পরিণামচিন্তার ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ করেন। যাহার পরিণামচিন্তা নাই, সে মূঢ়েরও মূঢ় ও পশুরও পশু স্বরূপ সন্দেহ কি?

সে যাহা হউক, এই রূপে যখন সকল বিষয়েরই পরিমাণ থাকা স্বতঃসিদ্ধ, তখন মুক্তিরও পরিণাম আছে, অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে। যদি মুক্তির পরিণাম স্বীকার না কর, তাহাতে প্রবৃত্তি হইবে কেন? এই রূপে সদ্যোমুক্তির পরিণাম বৈষ্ণবপদ। অর্থাৎ যোগী পুরুষ উল্লিখিত রূপে যে ব্রহ্মস্বরূপে আত্মযোগে লীন হইয়া, কার্য্য হইতে উপরত হয়েন, তাহাকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবপদ বলে। ঐ পদ প্রাপ্ত হইলে, আর কিছুরই অভাব বা প্রয়োজন হয় না। সুতরাং, বৈষ্ণব পদ বলিলে, সমুদায় পরিণামের অবধি বুঝাইয়া থাকে।

সংসারে যাহা কিছু দেখিতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই কাল, কর্ম্ম, দৈব ও অদৃষ্টের বশীভূত এবং বিকারবিশেষ হইতে সমুৎপন্ন; এই জন্য, ক্ষয়, বিনাশ ও জরাবসাদ প্রভৃতি দোষে দূষিত। অর্থাৎ কালই ভূতগণের সৃষ্টি করে, এবং কালই তাহাদের সংহার করে। ভাব অভাব সুখ অসুখ সমুদায়ই কালের কার্য্য। সুতরাং, যাহা সৃষ্টি সংহারাদি সমস্ত কার্য্যের প্রযোজক, তাহার নাম কাল। এই কাল প্রলয়সময়ে সমস্ত লয় করিয়া ভগবানে স্বয়ং লীন হয়। সৃষ্টি না থাকিলে, এই কালের আবশ্যকতা কি? কাল সৃষ্টির নিয়ামক ভগবানের আদেশমাত্র। অতএব, ভগবৎপদে তাহার প্রভুত্ব কোথায়? ইতিপূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, ভগবানের ভ্রূভঙ্গে কালেরও কালপ্রাপ্তি হয়। অদৃষ্ট শব্দে প্রারব্ধ। যাহার জন্মাদি কোনপ্রকার পরিচ্ছেদ নাই, তাহার আবার প্রারব্ধ কি? মানুষ যে

কর্ম্ম করিয়া তাহার শেষ না করে, তাহাকেই তাহার অদৃষ্ট বলিয়া থাকে। যদি কর্ম্মের ফল অবশ্যম্ভাবী স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে, অদৃষ্টের ফলও অবশ্যম্ভাবী, সন্দেহ কি? সংসার এইজন্যই অদৃষ্টের আয়ত্ত হইয়া আছে। বৈষ্ণব পদে সে সকলের সম্পর্ক নাই। কেন না, ভগবান্ কালেরও কাল, অদৃষ্টেরও অদৃষ্ট এবং দৈবেরও দৈব। এইজন্য শ্রুতিতে তাঁহাকে পরম কাল ও পরম দৈব এবং পরম অদৃষ্ট বলিয়া থাকে। প্রহ্লাদের জীবনী এ বিষয়ে জাজ্বল্যমান নিদর্শন। বৈষ্ণবগণ এইজন্য কোন কালেই অবসন্ন হয়েন না।

সত্ব রজঃ তমঃ প্রভৃতি বলিতে জগতের কারণপরম্পরা বুঝাইয়া থাকে। কেননা, এই সকলের সমবায়ে পরম্পরায় জগতের সৃষ্টি হইয়াছে। বৈষ্ণবপদ এই সকল কারণেরও অতীত। সুতরাং উহা সকল কারণের কারণ। এই রূপে, বৈষ্ণবপদের তুলনায় কারণ সকলও কার্য্যরূপে পরিণত হইয়া থাকে। বাষ্প যেমন শীতল হইলে, জল হইয়া, জলে মিলিত হয়, তখন আর তাহাকে বাষ্প বলা যায় না; তদ্রূপ যোগী পুরুষ ঐ বৈষ্ণবপদে লীন হইলে, তাঁহাকে আর কার্য্য বলিয়া প্রতীতি হইতে পারে না। যতক্ষণ আকাশ ঘটের অন্তর্গত, ততক্ষণই তাহাকে ঘটাকাশ বলা যায়; কিন্তু ঘট ভগ্ন হইলে, তন্মধ্যস্থ আকাশ স্বয়ং আকাশে মিলিত হইয়া থাকে। ফলতঃ, চৈতন্যাংশ আত্মার সহিত জড়পিণ্ড দেহের কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই। লোকের দেহ যেমন বস্ত্র দ্বারা আবৃত থাকে, সেইরূপ এই

স্থূল দেহই আত্মার আবরণমাত্র। পর্ব্বত অতি কঠিন পদার্থ; কিন্তু কৌশলসহায়ে তাহাকেও যেমন খণ্ড খণ্ড ও চূর্ণ করা যায়; তদ্বৎ সাধনাবলে জীর্ণ বস্ত্রের ন্যায়, এই স্থূলাবরণও পরিত্যক্ত হইতে পারে। সর্প যেমন নির্ম্মোক ত্যাগ করে, তদ্বৎ এই আবরণত্যাগও অনায়াস-সাধ্য। এ বিষয়ে কিছুমাত্র অসম্ভাবনা নাই।

বলিলে অসঙ্গত হইবে না যে, আত্মা চির কালই এই স্থূলাবরণে বদ্ধ হইয়া, কারারুদ্ধ বন্দীর ন্যায়, যাবৎ মৃত্যু অবস্থিতি করিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। আত্মার দেহাদি ব্যতিরিক্ত চৈতন্যাংশতা পর্য্যালোচনা করিলেই, ইহা সুস্পষ্ট প্রতীত হয়। চৈতন্য ও জড়তায় যে বিশেষ, তাহা সকলেই জানেন। আধ্যাত্মিক মতে এই জড়পিণ্ড সূর্য্যে ঐ পরমাত্মরূপ চৈতন্যের অংশ আছে। ঐ অংশ সকলের স্বভাব আলোক বিকিরণ ও প্রস্ফুরণ করা। দীপ নির্ব্বাণ হইলে, তাহার আলোকাংশ কোথায় যায়? অন্ধকারে মিশ্রিত হয়, ইহা কখন উত্তর হইতে পারে না; কারণ, জলে কখন তৈলের মিশ্রণ দেখা যায় না। যে বস্তু যাহার ধর্ম্মবিশিষ্ট, সে তাহাতেই পরিণত বা মিশ্রিত হইয়া থাকে। উত্তাপের প্রভাবে বাষ্পের কণা সকল এরূপ সূক্ষ্ম হয় যে, তাহা অনুভবেও আইসে না; কিন্তু তাই বলিয়া উহা কখন উত্তাপে মিলিত হয়, এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না। যদি মিলিত হইত, তাহা হইলে, জলের উদ্-ভব কোথা হইতে হইত? এইরূপ যুক্তিতে যোগিগণ আত্মায় আত্মার মিলন করিতে চেষ্টা করেন এবং সাধনা

বলে তদ্বিষয়ে কৃতকার্য্যও হইয়া থাকেন। ইহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। বিস্ময় কেবল তাহাতে কৃতকার্য্য না হওয়া। যাহা অগ্নি, তাহা অগ্নিতে মিশ্রিত হইবে, ইহাতে আর বৈচিত্র্য কি? চলাচল সংসারে এইপ্রকার শত শত বৈচিত্র্য সম্পাদিত হইয়া থাকে। স্থূলদর্শিরাই তাহাতে আশ্চর্য্য বোধ করে। ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়াই যোগশাস্ত্রের অধিকার হইয়াছে। পূরককুম্ভকাদি বিধিনিয়োগও এই যুক্তির সমুদ্ভূত। এক-মাত্র প্রেমযোগ সহায়ে এই সকল সাধিত হইয়া থাকে।

পঞ্চম পটল।

ঈশ্বরস্বরূপপরিচয়।

ভগবতী কহিলেন, বৎস! অধুনা সংক্ষেপে ঈশ্বর-স্বরূপ কীর্ত্তন করি, শ্রবণ কর। অনিমিষ শব্দে দেবতা বলে। শাস্ত্রাদিতে নির্দ্দেশ আছে, সর্ব্বশক্তি পরমাত্মা দ্রষ্টা বা সাক্ষী রূপে বিরাজমান থাকাতে, এই সংসার-কার্য্য যথানিয়মে পরিচালিত হইতেছে। তিনি যোগ-নিদ্রার আশ্রয়পূর্ব্বক স্বস্বরূপ অনুভবে প্রবৃত্ত হইলে, বাতাহত প্রদীপের ন্যায়, সহসা সমস্ত বিশ্বকার্য্য নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হয়। ঐরূপ যোগনিদ্রাকেই প্রলয় বলিয়া থাকে। প্রলয় শব্দের অর্থ বিনাশ নহে। বীজ যেমন বৃক্ষে লীন থাকে, তদ্বৎ সমস্ত সংসার পরমেশ্বরে লীন হয়। বীজ ভর্জ্জিত হইলেই, তাহার অঙ্কুরোৎপাদিকা

শক্তির বিনাশ হইয়া থাকে। ভগবান্ সকলের আদি-বীজ; ঐ বীজের উৎপাদিকা শক্তি নিত্য। পুনশ্চ, তিনি সর্ব্বদা সাক্ষিরূপে দর্শন করাতেই, সংসার জীবিতরূপে জাগ্রৎ রহিয়াছে। এইজন্য তাঁহাকে সর্ব্ব-জাগ্রৎ বা অনিমিষ কহে। তাঁহার যদি নিমেষ থাকিত, তাহা হইলে নিমিষে নিমিষে প্রলয় ঘটিত। মানুষের যখন চক্ষুর নিমেষ উপস্থিত হয়, তখন সে কিছুই দেখিতে পায় না। অথবা, যোগনিদ্রার সময় একবার নিমেষ উপস্থিত হওয়াতেই, মহাপ্রলয় ঘটিয়া থাকে। কিন্তু ঐ নিমেষ নামমাত্র। অনিমিষ বলিলে, যদিও ব্রহ্মাদিরও অনুভব হইয়া থাকে, কিন্তু লোকে অগ্রে প্রধানেরই গণনা হয়। এইজন্য অনিমিষ বলিলে, অগ্রে সর্ব্বপ্রধান বিষ্ণুকেই মনে পড়িয়া যায়।

ভগবান্ অনিমিষ বিষ্ণুর যে পালনী শক্তি আছে, দেবগণ তাহার অংশ। দিব্ ধাতুর অর্থ লীলাবিলাস। ভগবানের লীলাবিলাস যাহাতে আছে, তাহাকে দেব বা দেবতা বলে। ঐ সকল দেবরূপী অংশ সৃষ্টির রক্ষা জন্য প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, এবং সর্ব্বদা স্ব স্ব কার্য্য করিয়া থাকে। ইহা স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম যে, দিন রাত্রি প্রহরী থাকিলে, লোকে সহসা কোন দুষ্কার্য্য করিতে পারে না। দেবগণও আমাদের দিনরাত্রের ঈশ্বরনিযুক্ত প্রহরী। এইজন্য তাঁহাদিগকে সর্ব্বদা জাগ্রৎ থাকিতে হয় এবং এই-জন্য ভগবান্ তাঁহাদিগকেও অনিমিষ অর্থাৎ নিমেষশূন্য করিয়াছেন।

আবার, শুদ্ধ অনিমিষ হইলেই পালক শক্তির পূর্ণতা হয় না; কেননা, পরিপালক যদি সর্ব্বদা রুগ্ন হইয়া পড়িয়া থাকেন, তাহাতে বিবিধ বিশৃঙ্খল ঘটনার সম্ভাবনা। এইজন্য তিনি দেবতাদিগকে জরাশূন্য করিয়াছেন। এইজন্য দেবতাদের অন্যতর নাম নির্জ্জর। অর্থাৎ নির্জ্জর বলিলেই স্বর্গের দেবতা বুঝাইয়া যায়। আবার, যিনি সুন্দর রূপে পরিপালন করেন, তাঁহার দীর্ঘ জীবন সকলেরই প্রার্থনীয়। ইহার যুক্তি সুস্পষ্ট। এইজন্য, ভগবানের পালকশক্তি-স্বরূপ দেবগণ অমর হইয়াছেন। লৌকিক নিয়মেও ভাবিয়া দেখ, পরিপালক প্রভু যদি অমর হন, নির্জ্জর হন এবং সর্ব্বথা অনিমিষ হন, তাহা হইলে, সুখের সীমা থাকে না। যাহার সহিত দীর্ঘ দিনের পরিচয়, তিনি যেমন সমদুঃখসুখ হইবার সম্ভাবনা, এরূপ আর কেহই হইতে পারেন না। অতএব প্রভু যত অধিক দিন স্থায়ী হন, ততই প্রজাগণের মঙ্গল। এই জন্য, লোকপাল দেবগণের স্থায়ী জীবন বিহিত হইয়াছে।

মহাভাগ! স্বভাবজ মিত্রে যেরূপ প্রীতি হয়, পিতা মাতা স্ত্রীপুত্রাদিতেও সেরূপ প্রীতির সম্ভাবনা নাই। স্বভাবজ শব্দে অকপট বা অকৃত্রিম এবং প্রীতি শব্দে বিশ্বাসপূর্ব্বক প্রেম। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, পরমাত্মা ঈশ্বর মাতার মাতা, পিতার পিতা এবং বন্ধুরও বন্ধু। সুতরাং তাঁহা অপেক্ষা সহজ মিত্র আর কে হইতে পারে? যাহার মিত্রের সহিত আলাপ ও মিত্রের সহিত সহবাস; তাহার সমান ভাগ্যবান্ সংসারে আর কে আছে? ভগবান্

আমাদের নিত্য সঙ্গী; এক মুহূর্ত্তও আমাদিগকে ত্যাগ করেন না। আমরা যখন ইচ্ছা, তাঁহার সহিত আলাপ করিতে পারি। অতএব তাঁহা অপেক্ষা সহজ বন্ধু আমাদের আর কে আছে?

সংসার বিষবৃক্ষস্বরূপ। বিষের স্বভাব, সংমোহন ও বিপন্ন করা। সংসারে বদ্ধ হইলেও, পদে পদেই মোহ ও বিপদ্ উপস্থিত হইয়া থাকে। এইজন্য ইহার নাম বিষবৃক্ষ হইয়াছে। বিষবৃক্ষের ফল ভক্ষণ করিলে, প্রাণহানি হয়। সংসারের ফল নরক। নরকমগ্নের প্রাণ ত স্বভাবতই বিনষ্ট। বিধাতা ইহা দেখিয়া, করুণাপূর্ব্বক ঐ বিষবৃক্ষের দুইটী অমৃতফল নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছেন। প্রথমটী মিত্রের সহিত সহবাস, দ্বিতীয়টী বিদ্বানের সহিত সমাগম। এই দুইটীর একটীও মানুষ সিদ্ধ করিতে পারে। অথবা, বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিতে বিচার করিলে, এই দুইটী বিনা আয়াসে গৃহে বসিয়াই অন্ধ ও আতুরাদিরাও সিদ্ধ করিতে পারে। ভগবান্ আমাদের হৃদয়ের সখা, হৃদয়েই আছেন। আবার, তিনি স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ। এই রূপ একাধারে অকৃত্রিম বন্ধুত্ব ও অগাধবোধত্ব সংসারে কুত্রাপি সম্ভব নাই।

ফলতঃ, ভগবান্ ব্যতিরেকে প্রকৃত হৃদয়নাথ বন্ধু আর কেহ নাই। তাঁহাকে সকল কথাই মন খুলিয়া বলিতে পারা যায়। হৃদয় যখন দুরন্ত শোকে অধীর হয়, উৎকট রোগে ব্যাকুল হয়, সুবিষম বিষাদবিষে পদে পদেই মোহ প্রাপ্ত হয়, দারুণ পরিতাপানলে নিরতিশয় দগ্ধ হয়,

দুর্নিবার অন্তর্দ্দাহে দাবদগ্ধ হরিণের ন্যায় অতিমাত্র বিপন্ন হয়, আত্মগ্লানির গুরুতর আঘাতে ঘন ঘন আহত হয়, কিংবা যখন দুঃখরূপ বজ্রের কঠোর নিনাদে অন্তস্তল পর্য্যন্ত বিদারিত হইবার উপক্রম হয়, তখন সংসারের সামান্য বন্ধু তত্তৎ বেদনার প্রতিকার করিতে সমর্থ নহেন। তিনি না হয়, দুঃখে দুঃখ প্রকাশ এবং অশ্রুতে অশ্রু মিশ্রিত করিয়া, ক্ষণ কালের জন্য কিয়দংশে তাহার বেগ নিবারণ করিতে পারেন; এককালে নিরোধ করা তাঁহার সাধ্য হয় না। কিন্তু ভগবান্ একবারমাত্র কৃপাকণা প্রদর্শন করিলেই, তৎক্ষণাৎ সমস্ত বেদনার নিরাকরণ হয়। কেননা, তিনি নিত্য, অভয় ও শোকহীন এবং ভয়েরও ভয় ও ভয়াবহেরও ভয়াবহ। তাঁহার নাম করিলে, স্বয়ং ভয়ও ভয় পায়। অতএব তিনি ভিন্ন প্রকৃত হৃদয়নাথ বন্ধু কে হইতে পারে? মন যখন বিষয়রূপ বিষম বিষবেগে অধীরিত হইয়া, দাবদগ্ধ হরিণের ন্যায় ইতস্ততঃ ব্যাকুল ও বিব্রত হইয়া বিচরণ করে, কুত্রাপি স্বস্তিলাভ করিতে পারে না; এবং যখন লৌকিক বন্ধুর প্রীতিময় মধুরমূর্ত্তি দর্শন করিলেও, তাহার সেই গুরুতর বেদনার পরিহার হয় না, তখন ভগবান্ ব্যতিরেকে আর নিস্তারের উপায় নাই।

শাস্ত্রকারেরা বিপদকে বন্ধুতার কষপাষাণস্বরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অর্থাৎ, কষ্ঠি পাথরে স্বর্ণের যেমন পরীক্ষা হয়, তদ্বৎ বিপদে বন্ধুতার পরীক্ষা হইয়া থাকে। ভগবান্ সম্পদের অপেক্ষা বিপদের অধিক সুহৃদ্। এইজন্য তাঁহাকে বিপদের মধুসূদন কহে। মধু শব্দের প্রকৃত অর্থ বিপদের

পরমকক্ষা বা চূড়ান্ত সীমা। কেননা, পিতামহ স্বয়ং ব্রহ্মাকেও এই বিপদে বিব্রত হইতে হইয়াছিল। ভগবান্ সত্যপুরুষই তৎকালে তাঁহাকে এই বিপদে উদ্ধার করেন। তদবধি তাঁহার নাম বিপত্তির মধুসূদন হইয়াছে। ইহার অর্থ, বিপদের যে চূড়ান্ত সীমা, তিনি তাহা নাশ করেন। ভগবান্ ব্যতিরেকে অন্য কাহাতেও এই মধুসূদননামের অধিকার বা আরোপ দেখিতে পাওয়া যায় না। অর্থাৎ ইন্দ্র বলিলে যেমন দেবরাজকে বুঝায়, পক্ষীন্দ্র বা মৃগেন্দ্রাদির অনুভব হয় না; তদ্বৎ, মধুসূদন বলিলে একমাত্র সেই ভগবান্ বৈষ্ণবনাথকেই বুঝাইয়া থাকে।

ভক্তিশাস্ত্রে এইজন্যই লিখিত হইয়াছে, যে, সমস্ত জগতের একমাত্র আশ্রয় ভগবান্ বিষ্ণু বিদ্যমান থাকিতে, মূঢ় লোকে কিজন্য অন্যত্র সৌহার্দ্দ করে, যে সৌহার্দ্দে অনিষ্টই অধিক। আবার, ভাবিয়া দেখিলে, সংসারে কিছুই স্থায়ী নহে। অতএব, তাহাতে আবার সৌহার্দ্দ কি? এবং সংসার অস্থায়ী হইলে, সৌহার্দ্দও অস্থায়ী হইয়া থাকে। তাদৃশ অস্থায়ী সৌহার্দ্দেও লাভই বা কি? ফলতঃ, মানুষের সকলই আকাশকল্পনা।

ভক্তের প্রধান লক্ষণও ভগবানে অকৃত্রিম সৌহার্দ্দ প্রদর্শন করা। তথাহি, তাঁহারাই সংসারে ভক্তগণের শ্রেষ্ঠ, যাঁহারা অন্যত্র সৌহার্দ্দত্যাগ করিয়া, ভগবানে অপূর্ব্ব প্রীতি স্থাপন করেন। একমাত্র ঐ প্রীতিই অমৃতরূপে পরিণত হয়। অপূর্ব্ব শব্দে যাহা পূর্ব্বে আর কখন সংসারের কিছুতেই সেইরূপে প্রদর্শিত হয় নাই।

সংসারের যে প্রীতি, তাহাতে নূতনত্ব বা অকৃত্রিমতা নাই। কেননা, উহাতে স্বার্থের আচ্ছাদন আছে। পূর্ণ-চন্দ্রের জ্যোতিঃ অতি নির্ম্মল ও সর্ব্বভুবনপ্রকাশক হইলেও, মেঘ যদি তাহাকে আবৃত করে, তাহাতে সমস্ত প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়। সেই রূপ, প্রীতির স্বভাব আলোকময় হইলেও, স্বার্থের আবরণে তাহার মলিনতা উপস্থিত হয়। যেমন আলোক না থাকিলে, বস্তুদর্শন হয় না; সেইরূপ মলিন-প্রীতিতে পরম বস্তু ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ সাধ্য নহে। ইহা বলা বাহুল্য যে, দর্পণ মলিন হইলে, তাহাতে প্রতিবিম্ব পতিত হয় না। সেইরূপ, প্রীতিপ্রভৃতি মার্জ্জিত না হইলে, তাহাতে প্রীতিময় প্রেমময় পরমাত্মার প্রতিফলন হয় না। নির্ম্মল জলে আদর্শ সুস্পষ্ট লক্ষিত হইয়া থাকে। কলুষিত সলিলে সেরূপ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

সংসারে প্রায়ই হৃদয় গোপন করিয়া, প্রীতিপ্রভৃতির আদান প্রদান হইয়া থাকে। ঐরূপ প্রীতিকে চৌরপ্রীতি বলে। চৌরপ্রীতির পরিণাম বিসংবাদ ভিন্ন আর কিছুই নহে। সাংসারিক বিসংবাদ সকল শুদ্ধ ঐরূপ কারণে সমুদ্-ভূত হইয়া থাকে; ইহা প্রতিপাদন করা বাহুল্য। এইজন্য উল্লিখিত হইয়াছে, নিষ্কারণ ও ঐকান্তিক প্রীতিই শ্রেষ্ঠ প্রীতি। তদ্দ্বারা আত্মরূপী ভগবান্‌কে প্রাপ্ত হওয়া যায়। বৈষ্ণবগণ তাদৃশী প্রীতির সাহায্যে সর্ব্বদা শুদ্ধচিত্ত হইয়া কস্মিন্‌কালেও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়েন না। পণ্ডিতগণ ইত্যাকার পর্য্যালোচনা করিয়া অন্যত্র সৌহার্দ্দ ত্যাগ পূর্ব্বক একমাত্র

সেই বিষ্ণুপদেই আসক্ত হয়েন। ইহাই অধ্যাত্মতত্ত্বের একমাত্র উপদেশ এবং ইহাই বিজ্ঞানের একমাত্র আদেশ।

ষষ্ঠ পটল।

আত্মানাত্মবিচার।

দেবী কহিলেন, বৎস! অধ্যাত্মশাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, বালক যেমন দৌরাত্ম্য দ্বারা পিতা মাতার বিরাগ উৎপাদন করে, তদ্রূপ ঈশ্বরের অনুরাগসংগ্রহে বাসনা থাকিলে, দৌরাত্ম্য ত্যাগ করা বিধেয়। কেননা, তিনিও দৌরাত্ম্য দ্বারা সর্ব্বথা বিরক্ত হইয়া থাকেন। অন্যায় প্রার্থনাদি করিয়া তাহার পূরণ না হইলে, পিতা মাতাকে নানা প্রকারে ব্যতিব্যস্ত করা ইত্যাদিকে যেমন বালকের দৌরাত্ম্য বলে, তদ্রূপ দেহাদিতে আত্মবোধ করা ইত্যাদিকে ঈশ্বরসম্বন্ধে লোকের দৌরাত্ম্য বলিয়া থাকে। রাক্ষসরাজ রাবণ পিতামহের নিকট যে অমরবর প্রার্থনা করে, তাহাকেও দৌরাত্ম্য বলিয়া থাকে। ঐরূপ দৌরাত্ম্যের ফল হস্তসিদ্ধ; অর্থাৎ তৎক্ষণাৎ ফলিয়া থাকে। লোকের বুদ্ধি তাদৃশ দৌরাত্ম্যবলে পূর্ব্বাপরপর্য্যালোচনাপরিশূন্য হইয়া উঠে। তাহাতে সে আপনার দোষে আপনিই নিপতিত হয়। দশাননের চরিত্রে এ বিষয়ের সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে। রাজা বলি এইপ্রকার দৌরাত্ম্যেই পাতালকুহরে বদ্ধ হইয়াছিলেন। অন্বেষণ করিলে, এইরূপ ও অন্যরূপ দৃষ্টান্ত অসুলভ নহে।

শুক্তিতে রৌপ্যবোধ ও রজ্জুতে সর্পবোধ যেরূপ ভ্রমের হেতু ও বুদ্ধিমালিন্যের কারণ, তদ্রূপ দেহাদিতে আত্মবোধ অর্থাৎ যাহা আত্মা নহে, তাহাকে আত্মা বোধ করিয়া, মিথ্যায় সত্য-বুদ্ধি স্থাপন করিলে, দারুণ মোহের সঞ্চার হয়। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, মোহ হইতে স্মৃতিভ্রংশ, স্মৃতিভ্রংশে বুদ্ধিভ্রংশ এবং বুদ্ধিভ্রংশে প্রাণনাশরূপ বিপত্তি উপস্থিত হইয়া থাকে। ঐপ্রকার প্রাণনাশে দুর্নিবার নরকপরম্পরার আবির্ভাব হয়, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। অথবা, পরমার্থরূপ প্রাসাদে আরোহণ করিতে হইলে, একমাত্র বিশুদ্ধ জ্ঞানরূপ সোপান অবলম্বন করিতে হয়। জ্ঞান ব্যতিরেকে উহার দ্বিতীয় সোপান দেখিতে পাওয়া যায় না। আত্মানাত্মবিচার দ্বারা এই জ্ঞান সম্পন্ন হয়। ফলতঃ, আলোক হইতে অন্ধকার ভিন্ন পদার্থ; ইত্যাকার বোধ না থাকিলে, তাহাকে জড়শব্দে নির্দ্দেশ করা যায়। যে ব্যক্তি অন্ধকারকে আলোক বলিয়া বোধ করে, তাহার জীবনধারণ বিড়ম্বনা মাত্র। অসিকে কুবলয়লতা ভাবিয়া গলে দিলে, তৎক্ষণাৎ গলদেশ ও প্রাণ নাশের সম্ভাবনা, ইহা কোন্ ব্যক্তি স্বীকার না করিবে? অথবা, মরীচিকাকে জল ভাবিয়া, তাহার অনুসরণ পূর্ব্বক পিপাসার শান্তি জন্য প্রান্তরে ধাবমান হইলে, প্রচণ্ড রৌদ্রের উত্তাপে যে দগ্ধ হইতে হয়, তাহাই বা কোন্ ব্যক্তি স্বীকার না করিয়া থাকে? অথবা, সর্পের কর্ণস্থ আলোকবিশেষকে মণি ভাবিয়া, তাহার সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে, যে প্রাণনাশের সম্ভাবনা, তাহাই

বা কোন্ ব্যক্তি স্বীকার না করিবে? অথবা, প্রদীপের আলোকে কুড্ডাদিতে আপনার প্রতিবিম্ব দর্শন করিয়া, ভূতবোধে ব্যাকুল হইলে, মনের চাঞ্চল্য বশতঃ মোহাদি যে উপস্থিত হইবার সম্ভাবনা, তাহাই বা কোন্ ব্যক্তি স্বীকার না করিয়া থাকে? আধ্যাত্মিক পণ্ডিতগণ এইরূপ ও অন্যরূপ দৃষ্টান্ত দ্বারা দেহাদিতে আত্মবুদ্ধির বিষম বিপরিণাম বর্ণন করিয়া, তাহা পরিত্যাগ করিতে ভূয়োভূয় উপদেশ করেন। অনাত্মীয়কে আত্মীয়বোধে বিশ্বাস করিলে, যেরূপ অনিষ্টাপত্তির সম্ভাবনা, সেইরূপ দেহাদি যে যে বিষয় আত্মা হইতে ভিন্ন, তৎসমস্তকে আত্মা বলিয়া বোধ করিলেও, ঈশ্বরপ্রাপ্তিরূপ বিষম অনিষ্ট আপতিত হইয়া থাকে।

পুনশ্চ, দৌরাত্ম্য দ্বারা ভেদবুদ্ধি সমুৎপন্ন ও পরলোক পরিভ্রষ্ট হয়। এইজন্য, জ্ঞানিগণ সবিশেষবিচারশালিনী বুদ্ধির সাহায্যে তাহা ত্যাগ করিয়া থাকেন। মরীচিকা কখন তৃষ্ণা নাশ করিতে পারে না। মূঢ় লোকেই তাহাকে জল বলিয়া থাকে। অথবা জলের সহিত তাহার তুলনা করা মূঢ়ের কার্য্য। ইত্যাদি মহাজনবাক্য সকল আলোচনা কর।

সপ্তম পটল।

মুক্তি।

ভগবতী কহিলেন, অধুনা মুক্তি বিষয় বর্ণন করি, শ্রবণ কর। যেরূপ আলোকের পর অন্ধকার, সেইরূপ সুখের পর দুঃখ, এই নিয়মে সংসারচক্র পরিচালিত হইতেছে।

এইরূপ সুখ ও দুঃখ লইয়াই সংসার। সুখ কখন দুঃখ বিনা লব্ধ হয় না। সুতরাং লোকে যাহাকে সুখ বলে, তাহা দুঃখের নামান্তরমাত্র। এইজন্য, যোগিগণ সুখকামনা ত্যাগ করিয়া পরব্রহ্মরূপী ভগবানে মিলিত হইতে চেষ্টা করেন। ভগবানে যোগ হইলে, সুখ দুঃখ উভয়ই বিনষ্ট হয়। ঐরূপ সুখ দুঃখের অভাবকেই নির্ব্বাণ মুক্তি বলিয়া থাকে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন, যাহাতে সুখ নাই, দুঃখ নাই, সে আবার কিরূপ অবস্থা ? তাহার অনুভবই বা কিরূপে হইয়া থাকে ? (উত্তর) যাহাতে সর্ব্ব বর্ণের অভাব অর্থাৎ যাহার কোন বর্ণ নাই, তাহাকে শুক্ল বর্ণ বলে। এই রূপে শুক্লবর্ণের অনুভব করা যখন ব্যক্তিমাত্রেরই সাধ্য হইয়া থাকে, তখন, যাহাতে সুখ নাই, দুঃখ নাই, তাহা কিরূপ অবস্থা, তাহার অনুভব করাও অসাধ্য নহে।

যদি বল, আধ্যাত্মিক তাপত্রয়ের উন্মূলন হইয়া, সুখলাভ করাই মনুষ্যের উদ্দেশ্য। যাহাতে সেই সুখ না রহিল, তাহার আবার প্রার্থনা কি ? লোকে সুখের জন্যই চেষ্টা করে, এবং তাহা প্রাপ্ত হইলেই পরিতৃপ্ত হয়। (উত্তর) সংসারে থাকাকেই যে সুখ বলে, তাহার অর্থ নাই। তুমি উত্তম পান ভোজন পাইলে এবং উৎকৃষ্ট প্রাসাদাদিতে বাস করিলে, আপনাকে সুখী বোধ কর ; কিন্তু তোমার সহবাসী অপর লোকে অতি সামান্য গ্রাসাচ্ছাদনে তোমা অপেক্ষা বিপুল সুখ অনুভব করে। আবার, ঋষিগণ দিগ্‌বস্ত্র পরিধান, এবং অনাবৃত দেশে মৃত্তিকাদিতে শয়ন ইত্যাদি বিবিধ কৃচ্ছ্র

সাধন করিয়াও, পরম সুখে ও প্রফুল্লচিত্তে কালযাপন করেন। এই রূপে, সুখের নির্ণয় করিতে যাওয়া বিড়ম্বনামাত্র।

যদি বল, মুক্তিতে সুখও নাই, দুঃখও নাই, তবে কিজন্য তাদৃশ জড়বৎ মুক্তির প্রার্থনা করিয়া থাকে? (উত্তর) উহাতে নিরবচ্ছিন্ন আনন্দ ও অভয় আছে। অর্থাৎ, সংসারে এরূপ কোন বিষয় নাই, যাহাতে ভয় নাই। ধন, জন, জ্ঞান, যশঃ, বিদ্যা, বুদ্ধি যাহা কিছু সমুদায়ই ভয়পরিপূর্ণ। ধন বহু কষ্টে সঞ্চিত হয় এবং বহু কষ্টে রক্ষিত হয়। তাহার বিনাশের ভয় পদে পদে। আজি যে দশ জন স্বতঃ পরতঃ নানা প্রকারে আনুগত্য করিতেছে, কাল হয় ত সময় মন্দ হইল, আর তাহাদিগকে পাওয়া যাইবে না; এই ভয়ে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতে হয়। বহু কষ্টে যশঃ উপার্জ্জিত হইয়াছে; তজ্জন্য যশস্বী বলিয়া দশ জনে বিলক্ষণ গণ্য মান্য করিতেছে, কিন্তু কলঙ্কের ভয় পদে পদেই হৃদয়ে পদ গ্রহণ করিয়া আছে। সংসারের লোক অতীব দুর্ম্মুখ; কখন্ কি সামান্য সূত্রে অসামান্য গ্লানি প্রচার করে, কে বলিতে পারে? বিলক্ষণ বিদ্যা ও বুদ্ধি উপার্জ্জন করিলেও, সংসারে নির্ভয় ও নিশ্চিন্ত হইবার সম্ভাবনা নাই। পাছে ভ্রমপ্রমাদ ঘটিয়া, বাদীবর্গের নিকট পরাভব প্রাপ্ত হইতে হয়, ইত্যাকার ভয়ের কোন কালেই পর্য্যবসান নাই। এই রূপে সংসার কখনই নিরাপদ বা নির্ভয় নহে। মুক্তিতে সমুদায় সংসার বন্ধন ছেদন হওয়াতে উক্তরূপ ভয়ের কোন অংশে কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই।

আবার, সুখ থাকিলেই আনন্দ থাকে, ইহা কখন মনে

করিও না। সুখ ও আনন্দে অনেক দূরবর্ত্তিতা। সংসারে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। অনেকের শত শত দাসদাসী ও যানবাহনাদি বাহ্য সুখের বিপুল চিহ্ন সত্ত্বেও মনে কিছুমাত্র আনন্দ নাই, ইহা প্রায়ই দেখা যায়। সংসারের উচ্চপদমাত্রেই প্রায় ঐরূপ আনন্দ শূন্য। ফলতঃ, আনন্দ বস্তুস্বরূপ, সুখ ছায়ামাত্র। আনন্দ হৃদয়ের বন্ধন, সুখ আড়ম্বরমাত্র। আরও দেখ, যাহার শরীরে তৈল নাই, বস্ত্র নাই, অন্ন বিনা উদর মগ্ন ও অন্ত্র ভগ্ন হইয়া গিয়াছে; তাহারও আনন্দ দেখিতে পাওয়া যায়। নৃত্য, গীত ও বাদ্যোদ্যমাদি মহোৎসব সকল এ বিষয়ের নিদর্শন। রোগে শোকে যাহার শরীর জীর্ণ হইতেছে, বিষাদে সন্তাপে অহরহ দগ্ধ হইতেছে; কোনদিকে কিছুমাত্র সুখ নাই; মনোরম সঙ্গীতাদি শ্রবণাদি করিলে, তাহারও চিত্তে আনন্দের সঞ্চার হয়। অতএব, সুখ না থাকিলে, আনন্দ থাকে না, ইহা কখন মনেও করিও না। বালকের অবস্থা ও মুক্তের অবস্থা উভয়ই সমান। বালক যেমন সুখ না থাকিলেও, সর্ব্বদাই আনন্দিত, মুক্তিতেও তদ্রূপ সুখের অসত্ত্বে সর্ব্বদাই আনন্দ অনুভূত হইয়া থাকে। সুখের পর দুঃখ হইলে, হৃদয়ে যে গুরুতর আঘাত উপস্থিত হয়, তাহা সকলেই জানেন। পুনরায়, সুখের সঞ্চারেও ঐ আঘাতবেদনার অপনয় দুর্ঘট। দাবদগ্ধ হরিণ নিরাপদ উদ্যানাদি প্রাপ্ত হইলেও, সর্ব্বদা চকিত চকিত বিচরণ করিয়া থাকে। পাছে পুনরায় আবার অগ্নিভয়ে পতিত হইতে হয়, এই শঙ্কায় অহরহ তাহার হৃদয় পূর্ণ থাকে।

ফলতঃ, সংসারের সমুদায়ই খণ্ডিতভাব। পূর্ণিমা হইলেই অমাবস্যা হয়। পদ্ম অতি মনোহর, কিন্তু তাহার মৃণালে কণ্টক। সেই রূপ, যাহার বাহ্য সৌন্দর্য্যের সীমা নাই, তাহার মন যার পর নাই কুৎসিত। অনেকের যশঃ আছে; কিন্তু তাহার সৌরভ নাই। কিংশুকের বাহ্য দৃশ্য পরমশোভাময়, কিন্তু তাহার আমোদ নাই। চন্দ্র ষোল কলায় উদিত হইলেন, রাহু আসিয়া তাঁহাকে গ্রাস করিল সহসা। মানুষ উত্তমরূপ বিদ্যাবুদ্ধি শিখিয়া, সংসার উজ্জ্বল করিবার উপক্রম করিতেছে, কাল কোথা হইতে ব্যাঘ্রের ন্যায় তাহাকে আক্রমণ করিয়া লইয়া গেল। বসন্তের পর ভয়াবহ গ্রীষ্ম এবং গ্রীষ্মের পর দুরন্ত শীত। যৌবনের পর বার্দ্ধক্য, বার্দ্ধক্যের পর দুর্নিবার জরাজীর্ণতা। আকাশের চতুর্দ্দিক্ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, সহসা নিবিড় ঘনমণ্ডলীর সমাগমে ঘোরতর অন্ধকার উপস্থিত। মানুষ উপাদেয় ভোগ্য সম্ভোগ করিয়া, দিব্যকান্তিকলেবর, পর ক্ষণেই রোগে শোকে কঙ্কালমাত্রাবশিষ্ট। এই রূপে, দুগ্ধে জল দিলে, যেমন জলের চিহ্নমাত্র লক্ষিত হয় না, তদ্রূপ, সুখ দুঃখ পরস্পর এরূপ ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশ্রিত হইয়া আছে যে, পরস্পরের নির্ব্বাচন করা সহজ নহে। যাহারা এই রূপে সংসারে সুখের অন্বেষণ করিতে যায়, তাহারা মরীচিকায় পিপাসা শান্তি করিতে উদ্যত হয়, অথবা মরুভূমিতে বীজরোপণ করিয়া, ফলপ্রাপ্তির অভিলাষ করিয়া থাকে।

অষ্টম পটল।

প্রজ্ঞান ও ব্রহ্মের একতা।

ভগবতী কহিলেন, মুক্তিস্বরূপ কীর্ত্তন করিলাম। অধুনা প্রজ্ঞানস্বরূপ কীর্ত্তন করিব।

ব্রহ্ম শব্দে প্রজ্ঞানচৈতন্য। সূর্য্যের উদয়ে যেমন রূপ-গ্রহ অর্থাৎ দৃশ্য পদার্থের স্ফূর্ত্তি হয়, তদ্রূপ এই চৈতন্যবলে বুদ্ধির প্রকাশ হইয়া থাকে। বুদ্ধির প্রকাশেই ইন্দ্রিয়-গণের প্রকাশ। অর্থাৎ বুদ্ধি জড়স্বভাব; উহা যেন সর্ব্বদাই নিদ্রিত হইয়া আছে। উল্লিখিত প্রজ্ঞানচৈতন্য বুদ্ধিকে জাগরিত ও চেতনাপ্রদান করে। বুদ্ধি জাগরিত হইলে, ইন্দ্রিয়গণেরও চেতনা সম্পন্ন হয়। কৃত্রিম যন্ত্রের সহিত এই বুদ্ধির বিলক্ষণ উপমা হইতে পারে। চৈতন্য ঐ যন্ত্রের পরিচালক। ইন্দ্রিয় সকল ঐ যন্ত্রের শাখা প্রশাখা বা অঙ্গ উপাঙ্গ। চালক যেমন চালাইয়া দিলে, যন্ত্র আপনার সমু-দায় অঙ্গোপাঙ্গের সহিত পরিচালিত হইয়া, অভীষ্ট কার্য্য সম্পাদন করে; তদ্রূপ প্রজ্ঞান চৈতন্যের চালনায় প্রথমতঃ বুদ্ধি পরিচালিত হইয়া, সমুদায় ইন্দ্রিয় তৎক্ষণাৎ পরিচালিত করিয়া থাকে। বুদ্ধির সঞ্চারমাত্রে ইন্দ্রিয়গণ, কষাহত ঘোটকের ন্যায়, উত্তেজিত হইয়া, স্ব স্ব বিষয়ে ধাবমান হয়। বুদ্ধির এককালীন সঞ্চার না হইলে, এককালীন শব্দস্পর্শাদি-জ্ঞান সম্ভব নহে। অর্থাৎ এক ব্যক্তি যে এক কালেই যুগপৎ শ্রবণ, দর্শন ও স্পর্শনাদি দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ বিষয় পরিগ্রহ

করিতে পারে, ঐপ্রকার এককালীন বুদ্ধির সঞ্চারই তাহার কারণ। একটী যন্ত্রেও যুগপৎ পৃথক্ পৃথক্ কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে, ইহা কাহারও অবিদিত নাই। তথাহি, প্রজ্ঞানচৈতন্যের আদি নাই। উহাই সমুদায় চরাচরের একমাত্র আদি, নিয়ন্তা ও পরম হিতজনক। স্বপ্ন বা সুষুপ্তি কোন অবস্থাতেই উহা সুপ্ত হয় না; প্রত্যুত, সকল অবস্থাতেই জাগরিত আছে। সুতরাং, উহাই পরমাত্মা ও সত্যস্বরূপ। শ্রুতিতেও বর্ণিত হইয়াছে, যিনি সত্যস্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম। কিঞ্চ, যাঁহা হইতে দৃশ্যমান ভূত সকল জন্মিয়াছে এবং জন্মিয়া যাঁহার আশ্রয়ে জীবিত আছে, তিনিই ব্রহ্ম। পুনশ্চ, আদি-যুগ সমাগত হইলে, ভূত সকল যাঁহা হইতে উৎপন্ন হয় এবং পুনরায় যুগক্ষয়ে যাঁহাতে লীন হইয়া থাকে, তিনিই ব্রহ্ম।

এই সকল পর্য্যালোচনা করিলে, ব্রহ্ম ও প্রজ্ঞানচৈতন্যের একতাবিষয়ে কোনরূপ সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে না।

মত্ত প্রমত্ত যে কোন অবস্থায় মানুষের বা অন্যান্য জীবের যে শ্বাস প্রশ্বাস যথানিয়মে সম্পন্ন হইয়া, জীবন রক্ষা করিয়া থাকে, এই প্রজ্ঞানই তাহার একমাত্র সাধন। মানুষ ইচ্ছামাত্রেই সহসা উদ্বন্ধনাদি দ্বারা প্রাণত্যাগ করিতে সমর্থ হয় না; অনেকে যে আত্মহত্যায় উদ্যত হইয়া, সহসা ধৃত বা গৃহীতবৎ তাহাতে পশ্চাৎপদ হয় এবং গাঢ়তর অন্ধকারে বা অতীব গহন প্রান্তরাদিতে সহসা কোন গুরুতর দুষ্কৃতের অনুষ্ঠান করিতে যে তাহার সাহস হয় না, প্রজ্ঞানচৈতন্যের সান্নিধ্যযোগই তাহার হেতু। এই সান্নিধ্যযোগের অন্যতর

নাম হৃষীকেশ। হৃষীক শব্দে ইন্দ্রিয় সমুদায় এবং ঈশ শব্দে নিয়ন্তা। (১)

---

(১) জানামি ধর্ম্মং ন চ মে প্রবৃত্তিঃ
জানাম্যধর্ম্মং ন চ মে নিবৃত্তিঃ।
ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদি স্থিতেন
যথৈব নীতোঽস্মি তথা করোমি॥

অর্থাৎ আমি ধর্ম্ম জানি, তাহাতে আমার প্রবৃত্তি নাই; অধর্ম্ম জানি, তাহাতেও আমার নিবৃত্তি নাই। হে হৃষীকেশ! তুমিই হৃদয়ে থাকিয়া, আমাকে যেরূপে লওয়াও, আমি তাহাই করিয়া থাকি।

ইহার ফলিতার্থ এই রূপ, হে হৃষীকেশ! আমি যে ধর্ম্মপথে প্রবৃত্ত ও অধর্ম্মপথে বিনিবৃত্ত হই, তুমিই তাহার কারণ। কিন্তু অনেক আত্মাভিমানী অন্ধ পণ্ডিত ইহার এইপ্রকার অর্থ করিয়া থাকেন, "হে হৃষীকেশ! আমি যে পাপ করি, তাহার কারণ তুমি এবং যে পুণ্য করি, তাহারও কারণ তুমি।" এই রূপে যাহারা স্ব স্ব পাপের ভার ঈশ্বরের স্কন্ধে আরোপিত করিয়া, স্বয়ং নিশ্চিন্ত হইতে চেষ্টা করে, তাহাদের ক্ষুদ্র-দুর্ব্বল-স্তব্ধ-হৃদয়তার সীমা বা আত্মান্ধতার উপমা নাই। যিনি অপাপবিদ্ধ, অদোষসম্পৃক্ত ও পরম পুণ্যময়, সেই শুদ্ধসত্ব পাবনস্বরূপ ঈশ্বরে পাপকল্পনা কি অসমসাহসিকতা, ভাবিলে শরীর লোমাঞ্চ হইয়া থাকে!

পুনশ্চ, প্রজ্ঞানচৈতন্যরূপী ব্রহ্মকেই বৈষ্ণবপদ বলিয়া থাকে। যে পদে মহাভাগ ধ্রুব, মতিমান্ প্রহ্লাদ ও মহামনা নারদ অধিষ্ঠিত হইয়াছেন। অথবা, আমাদের শাস্ত্র সকল সর্ব্বতোভাবে রূপকময়। নীতিকারেরা যেমন কথাচ্ছলে অর্থাৎ ব্যাঘ্র ভল্লুকাদির উপাখ্যান বা কথা দ্বারা অতীব দুরূহ নীতিসকলের সমাধান পূর্ব্বক সুকুমারমতি শিশুদিগকে অনায়াসে বুঝাইয়া থাকেন, শাস্ত্রকারেরাও সেইরূপ রূপক দ্বারা অতীব দুরূহ ঈশ্বরবিষয় সংসারীর হৃদয়ে প্রবেশ করাইতে চেষ্টা করেন। যথা, ধ্রুব শব্দের প্রকৃত অর্থ স্থির বা অক্ষয়, প্রহ্লাদ শব্দে অতিমাত্র আনন্দ এবং নারদশব্দে বিশুদ্ধ

নবম পটল।

বিষয়স্বরূপবর্ণন।

ভগবতী কহিলেন, বিষয় শব্দে মায়াকৃত প্রধান আবরণ। সূর্য্য অতিমাত্র তেজোময় ও দীপ্তিবিশিষ্ট হইলেও, মেঘ তাহাকে অনায়াসেই আবৃত করে। সেই রূপ, মন অতিমাত্র তেজস্বী হইলেও, মায়াকৃত আবরণে সহসা বদ্ধ হইয়া থাকে। মেঘ দ্বারা সূর্য্যের রোধ হইলে, যেমন জগৎ অন্ধকারে ব্যাপ্ত হয়, তদ্রূপ মায়াবৃত মন অতিমাত্র সংকুচিত হইয়া থাকে। সংকুচিত মনে পরমার্থদর্শন সহজ নহে। এইজন্য, যে কোন উপায়ে সেই মায়াবরণ ভেদ করা বিধেয়। ফলতঃ, ভগবান্ মায়ার অতীত। অতএব, মায়ার অতিক্রম না করিলে, তাঁহাকে প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট। তথাহি, ভগবান্ অজিতের জয় করিতে হইলে, পরম শ্রেষ্ঠ ও অবিচলিত আত্মশুদ্ধিই তাহার সাধন হইয়া থাকে। তদ্ব্যতীত অন্যান্য সাধন সমস্ত, হস্তিস্নানের ন্যায়, নিরর্থক। (১)

জ্ঞানস্বরূপ। সুতরাং "ধ্রুব বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন" বলিলে, সুস্পষ্ট প্রতীতি হইতে পারে, যে, বৈষ্ণবপদ প্রাপ্ত হইলে, আর ক্ষয় বা তৎসদৃশ কোনরূপ বিকারপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। এই রূপ, প্রহ্লাদ ঐ পদ পাইয়াছিলেন, বলিলে, ইহাই বুঝিতে হইবে, যে ঐ পদ নিরবচ্ছিন্ন আনন্দময়। ইত্যাদি

(১) এখানে জয় শব্দে সর্ব্বতোভাবে লাভ করা। হস্তিস্নান শব্দে কিছুই নহে। অর্থাৎ হস্তীকে স্নান করাইয়া দিলে, সে তৎক্ষণাৎ পুনরায় ধূলি দ্বারা শরীর আচ্ছন্ন করে; সুতরাং তাহার স্নান করা আর না করা যেমন উভয়ই সমান, তদ্রূপ বিষয়বাসনাবিসর্জ্জনাদি দ্বারা আত্মার কলুষ সমস্ত প্রক্ষালিত না হইলে, অন্য উপায়ে ভগবানকে প্রাপ্ত হইতে চেষ্টা করা আর

শাস্ত্রকারেরা বিষয়বাসনার তিনপ্রকার গতি নির্দ্দেশ করেন। যথা, ভবদ্‌বিঘ্না, ভূতবিঘ্না ও ভবিষ্যবিঘ্না। তন্মধ্যে যাহা দ্বারা প্রারব্ধ বা প্রাক্তন বিনষ্ট হয়, তাহাকে ভূত-বিঘ্না কহে। যাহা দ্বারা বর্ত্তমান বিনষ্ট হয়, তাহার নাম ভবদ্বিঘ্না। আর, যাহা ভবিষ্যৎ বিনষ্ট করে, তাহাকে ভবিষ্যবিঘ্না বলিয়া থাকে। যাবৎ কর্ম্মের ক্ষয় না হয়, তাবৎ দেহপরম্পরা ভোগ হইয়া থাকে। বীজ যেমন ভর্জ্জিত হইলে, তাহার অঙ্কুরোৎপাদিকা শক্তির বিনাশ হয়, সুতরাং তাহাতে আর বৃক্ষ জন্মিবার সম্ভাবনা থাকে না; তদ্রূপ কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মক্ষয় হইলে, তাহার সংসারোৎপাদিকা শক্তির বিনাশ হইয়া থাকে। তখন আর দেহমাত্রের ভোগ করিতে হয় না। লোকে যখন নিষ্কাম হইয়া, সমুদায় কর্ম্মের চরম স্থান সেই ভগবানে আপনার অনুষ্ঠিত কর্ম্ম সকল সমর্পণ করে, তখনই তাহাকে কর্ম্ম দ্বারা কর্ম্মের ক্ষয় বলিয়া থাকে। কেননা, ঐপ্রকার সমর্পণ দ্বারা উদিত ভক্তির দৃঢ়তা বা পরিপাক হয়। ভক্তির পরিপাকই মুক্তির মূল সোপান। ভগবানই কর্ত্তা ও কারয়িতা, আমি কিছুই নহি, এই রূপে অহংকারত্যাগ দ্বারা ক্রমে ক্রমে জ্ঞানের উপচয় হইলে, সমস্ত তন্ময় দেখিয়া, তৎক্ষণাৎ ভক্তির উদয় হইয়া থাকে। পুনঃপুনঃ অভ্যাস দ্বারা সেই ভক্তির ঐকান্তিক পরিপাক হইলে, মুক্তির দ্বার আপনা হইতেই উদ্‌ঘাটিত হয়।

না করা উভয়ই সমান। সুতরাং, মূঢ় ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি শুদ্ধ নরকলাভের নিমিত্ত তাদৃশ পণ্ডশ্রমে প্রবৃত্ত হইতে পারে? ইহাই অধ্যাত্ম-মীমাংসার উপদেশ।

তখন একবারেই সংসারনিবৃত্তি সংঘটিত হইয়া থাকে। ইহারই নাম মুখ্য সাধন।

যে যাহা হউক, এই রূপে যখন দেহযোগ অবশ্যম্ভাবী, তখন প্রারব্ধ বা প্রাক্তনও অবশ্য স্বীকার করিতে হয়। যাহার প্রারব্ধ নির্দ্দোষ বা উৎকৃষ্ট হইয়া থাকে, তাহার জন্মান্তরীণ ফলও তদনুরূপ উৎকর্ষ প্রাপ্ত হয়। (১)

(১) "তাং হংসমালাঃ শরদীব গঙ্গাং
প্রপেদিরে প্রাক্তনজন্মবিদ্যাঃ। ইত্যাদি

অর্থাৎ শরৎকালে হংসসকল যেরূপ গঙ্গাকে আশ্রয় করে, তদ্রূপ, পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত বিদ্যা (ইহজন্মে) যথাসময়ে তাঁহাকে অর্থাৎ পার্ব্বতীকে প্রাপ্ত হইল।" মহাকবি কালিদাস কুমারসম্ভবনামক প্রসিদ্ধ কাব্যে এইপ্রকার প্রারব্ধ বর্ণনা করিয়াছেন। বেদান্তেও ইহার নির্দ্দেশ আছে। বিষয়বাসনায় জড়িত হইলে, এই প্রারব্ধ বিনষ্ট হইয়া থাকে।

কাব্যশাস্ত্রে লিখিত আছে,—

"মরণং প্রকৃতিঃ শরীরিণাং
বিকৃতির্জীবিতমুচ্যতে বুধৈঃ।
ক্ষণমপ্যবতিষ্ঠতে শ্বসন্
যদি জন্তুর্ননু লাভবানসৌ॥"

অর্থাৎ, পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন, শরীরিগণের মরণই প্রকৃতি এবং জীবনই বিকৃতি। অতএব প্রাণিগণ যদি ক্ষণকালও বাঁচিয়া থাকে, তাহাই তাহাদের পরম লাভ।" কিন্তু বিষয়বাসনায় জড়িত হইলে, এইপ্রকার পরম লাভও বিনষ্ট হইয়া থাকে। এইজন্যই কথিত হইয়াছে,—

"আয়ুর্হরতি বৈ পুংসাং উদ্যন্নস্তঞ্চ যন্নসৌ।
তস্যর্ত্তে যৎক্ষণো নীত উত্তমশ্লোকবার্ত্তয়া॥"

সূর্য্য প্রতিদিন উদিত ও অস্তমিত হইয়া, পুরুষের আয়ু হরণ করিতেছেন। কিন্তু যে ব্যক্তি পুণ্যশ্লোক বাসুদেবের কথাপ্রসঙ্গে ক্ষণমাত্রও যাপন করে, তাহার আয়ু তিনি হরণ করিতে পারেন না। তথাহি,—

"অনুদিনমিদমায়ুঃ সর্ব্বদাসৎপ্রসঙ্গৈ-
র্ব্বহুবিধপরিতাপৈঃ ক্ষীয়তে ব্যর্থমেব।
হরিচরিতসুধাভিঃ সিচ্যমানং তদেতৎ
ক্ষণমপি সফলং স্যাৎ ইত্যয়ং মে প্রয়াসঃ॥

অর্থাৎ সর্ব্বদা বহুবিধ পরিতাপময় অসৎকথাপ্রসঙ্গে এই আয়ু প্রতিদিন বৃথা ক্ষয় পাইয়া থাকে। অতএব যাহাতে উহা হরিচরিতসুধায় অভিষিক্ত হইয়া, ক্ষণমাত্রও সফল হয়, ইহাই আমার প্রয়াস।

ফলতঃ লোকের আয়ু নানা প্রকারে স্বভাবতঃ ক্ষয় পাইতেছে। তাহাকে আর পুনরায় বিষয়বাসনার অনুসরণ দ্বারা ক্ষয় করা বিধেয় হয় না। কেননা, বৃথা ক্ষয় পাইবার জন্য লোকের আয়ুর সৃষ্টি হয় নাই। উল্লিখিত মহাজনবাক্য সকল পর্য্যালোচনা করিলে, ঐরূপই প্রতীত হইয়া থাকে। অসৎ শব্দে বিষয়, ইহা শাস্ত্র সকলে ভূয়োভূয়ঃ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যাহা কিছুই নহে, এবং যাহাতে নিরবচ্ছিন্ন অমঙ্গল উপলব্ধ হইয়া থাকে, তাহার নাম অসৎ। দৃশ্যমান বিষয় সকলও কিছুই নহে এবং সর্ব্বতোভাবে অমঙ্গলময়। এইজন্য অসৎপ্রসঙ্গে বহুবিধ পরিতাপ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিঞ্চ,—

"কোঽত্র মূঢ়াৎ সমারম্ভেৎ পরলোকনিশাতনীম্।
তৃষ্ণামাত্মনিপাতায় শোকানাং শতদুর্ভরাম্॥"

অর্থাৎ, যাহা দ্বারা পরলোক বিনষ্ট হয় এবং যাহা শত শত শোকভারে অতিমাত্র দুর্ভর, তাদৃশী তৃষ্ণাকে মূঢ় ব্যতিরেকে আর কোন্ ব্যক্তি আত্মনিপাত জন্য আশ্রয় করিতে পারে? তৃষ্ণা শব্দে বিষয়বাসনা, আত্মনিপাত শব্দে নরকপরম্পরা, এবং শোক শব্দে আত্মমোহকর বা জ্ঞানহানিকর মর্ম্মান্তিক যাতনা। অর্থাৎ বিষয়বাসনার পরিণাম পরলোকভ্রংশ, বিবিধ নরক ও নানাপ্রকার দুর্ব্বিসহ শোক। এইজন্যই মহারাজ যযাতি কহিয়াছিলেন,

"তাং তৃষ্ণাং ত্যজতঃ সুখম্।"

অর্থাৎ বিষয়পিপাসা ত্যাগ করিলেই সুখ।" এই সুখ, ভূত ভবিষ্য বর্ত্তমান কালত্রয়ব্যাপী, বিবেচনা করিতে হইবে। কেননা, বর্ত্তমানের সুখ সুখ নহে। কাল অপরিচ্ছিন্ন; ভূত ভবিষ্য ও বর্ত্তমান ইত্যাদি বিভাগ বা

পরিচ্ছেদ কল্পনামাত্র। সুতরাং, যাহা ভূত ও ভবিষ্য, তাহাই বর্ত্তমান। অর্থাৎ লোকে যাহাকে ভূত ও ভবিষ্য বলে, তাহাও এক সময়ে বর্ত্তমান ছিল। এইপ্রকার পর্য্যালোচনা করিলে, যে সুখ কালত্রয়ব্যাপী, তাহাই প্রকৃত সুখ বলিয়া পরিগণিত হয়। তৃষ্ণা বা বিষয়বাসনায় জড়িত হইলে, তাদৃশ সুখের সর্ব্বতোভাবে প্রতিঘাত হইয়া থাকে। এইজন্য কেহ কেহ তাপত্রয় শব্দে ভূত তাপ, ভবিষ্য তাপ ও বর্ত্তমান তাপ, এইপ্রকার অর্থ করিয়া থাকেন। দুঃখত্রয় বলিলেও, এইপ্রকার বুঝিতে হইবে। সুতরাং দর্শনশাস্ত্রের লিখিত

"দুঃখত্রয়াভিঘাতাজ্জিজ্ঞাসা তদপঘাতকে হেতৌ।"

ইত্যাদি বাক্যের অন্তর্গত দুঃখত্রয়শব্দে যেমন আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই তিনপ্রকার তাপ বুঝাইয়া থাকে, তদ্রূপ, ভূত দুঃখ, ভবিষ্য দুঃখ ও বর্ত্তমান দুঃখ ইত্যাদি অর্থ করিলেও অসঙ্গত হয় না। দর্শন অপেক্ষা ভক্তিশাস্ত্রের প্রাধান্য আছে, ইহা প্রতিপাদন করা বাহুল্য। সেই ভক্তিশাস্ত্রে ঐরূপ উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। এ বিষয় যথাস্থানে বিবেচিত হইবে।

পুনশ্চ, শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যোগাচার্য্যগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বায়ু দ্বারাই ক্ষুধা তৃষ্ণা প্রভৃতি পার্থিব বিকার সকলের উদ্ভব হইয়া থাকে। ক্ষুধা তৃষ্ণা থাকিতে, মানুষ কখন স্থির হইতে পারে না। এই ক্ষুধাতৃষ্ণা হইতেই বিষয়বাসনার বেগ বর্দ্ধিত হইয়া, পরমার্থপ্রাপ্তির ব্যাঘাত সাধন করে। কেননা, মন চঞ্চল হইলে, অস্থির জলে সূর্য্যবিম্বের ন্যায়, তাহাতে পরমার্থ-জ্যোতিঃ স্থান পাইতে পারে না। সুতরাং, মুক্তিও সুদূরপরাহত হইয়া থাকে।

সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, ভেক প্রভৃতি কতিপয় জন্তু শীতকালের ৩।৪ মাস কিছুই না খাইয়া, অনবরত কেবল নিদ্রা গিয়া থাকে। তৎকালে বায়ুর নিরোধ জন্য সমাধিবশে তাহারা একবারেই ইন্দ্রিয়শূন্য হইয়া যায়। এমন কি, হস্তপদ কাটিয়া দিলেও, তাহাদের চৈতন্য হয় না। এইপ্রকার দৃষ্টান্তে যোগশাস্ত্রে মাণ্ডূক্যসমাধির উদ্ভাবনা হইয়াছে। যাহাদের ধারণা আছে, মানুষ দুই এক সপ্তাহ না খাইলে, মরিয়া যায়, তাহাদের পক্ষে এই দৃষ্টান্ত, বোধ হয়, পর্য্যাপ্ত হইতে পারে।

আমরা পূর্ব্বে নির্দ্দেশ করিয়াছি যে, স্বয়ং ভগবান্ স্বকীয় পাদপদ্ম-বিনিঃসৃত অমৃত দ্বারা যোগীর সমুদয় ক্ষুধা ও সমুদায় পিপাসা দূর করিয়া, সর্ব্বদা পুষ্টি সাধন করেন। আবার, বায়ুনিরোধ করিলে, শীতবাত প্রভৃতি দ্বন্দ্বসহিষ্ণুতাশক্তি যার পর নাই বলবতী হইয়া থাকে। যোগিগণ যে পঞ্চ-তপঃ করেন, তাহাই ইহার নিদর্শন।

ইহা সকলেই জানেন, বাষ্প মধ্যে রুদ্ধ থাকাতে, ফানস প্রভৃতি যেমন আপনা আপনি আকাশে বিচরণ করে, তদ্রূপ বায়ুর রোধ দ্বারা শরীরের ভারবত্তার হ্রাস হইয়া যায়। তখন আর কিছুতেই তাহার শ্রান্তি বোধ হয় না।

বায়ুর স্বভাব তরঙ্গ সমুৎপাদন করা। তরঙ্গের স্বভাব শ্রমক্লম অবসাদ ইত্যাদি আবির্ভাব করা। মানুষ যে সত্বর অবসন্ন হইয়া, মৃত্যুমুখে নিপতিত হয়, এইপ্রকার তরঙ্গের ঘাতপ্রতিঘাতই তাহার কারণ। আবার, যোগিগণ যে দীর্ঘজীবী হইয়া থাকেন, বায়ুর সংযম করিয়া তরঙ্গের নিরোধ করাই তাহার একমাত্র হেতু। ইহা স্বভাবসিদ্ধ নিয়ম যে, বায়ু দ্বারা তরঙ্গ উত্থিত হইয়া, জল আলোড়িত করিলে, তাহাতে বিম্বাদির প্রতিফলন হইতে পারে না। সেই রূপ, শরীরস্থ বায়ুর প্রতিঘাতে মন চঞ্চল থাকিলে, তাহাতে আত্মজ্যোতির বিস্ফুরণ হওয়া সম্ভব নহে।

শরীরের মধ্যে যতক্ষণ বায়ুর গতি থাকিবে, ততক্ষণ ইন্দ্রিয় সকলের কার্য্য-রোধ হইবে না। বাষ্প বলবান্ থাকিতে, বাষ্পীয় যন্ত্রের গতিরোধ করা সাধ্য নহে। আবার, অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন, যে, জাহাজ চলিয়া গেলেও, অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত একটী জলরেখা তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনেকদূর পর্য্যন্ত ধাবমান হইয়া থাকে। সেই রূপ, বায়ুনিরোধ হইলেও, তাহার তরঙ্গ জন্য চঞ্চলতার বেগ কিয়ৎক্ষণ পর্য্যন্ত থাকিয়া যায়। চলিত কথায় ইহাকে 'ধাব্‌কা বা ধাক্কা বলে। কিয়ৎক্ষণ স্থিরভাবে বসিয়া থাকিলে, এই ধাব্‌কা দূর হইয়া যায়। এইজন্য 'মুহূর্ত্তার্দ্ধকাল নিরপেক্ষ হইয়া, অবস্থিতি করিতে' যোগশাস্ত্রে উপদেশ দেওয়া হইয়া থাকে। পুনশ্চ, ইহাও অনেকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, যদি ক্রমাগত অন্ধকারে থাকা যায়, তাহাতে, যত না দৃষ্টিশক্তি প্রতিহত হয়, আলোক হইতে সহসা অন্ধকারে আসিলে, ততোধিক প্রতিহত হইয়া থাকে। আবার, ক্রমাগত সূর্য্যের কঠোর আলোকে ভ্রমণ করিয়া, সহসা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলে, কিয়ৎক্ষণ যেন

দশম পটল।

বিবিধতত্ত্বকথন।

মূর্দ্ধাশব্দে ব্রহ্মরন্ধ্র। এই ব্রহ্মরন্ধ্রেই ব্রহ্মার বিহারাদি লীলা উল্লিখিত হইয়াছে। সহজ কথায় ইহাকে মস্তিষ্ক অর্থাৎ মন ও বুদ্ধির স্থান কহিয়া থাকে। যোগশাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত হইয়াছে, যে, মন ও বুদ্ধির একাগ্রতা সহকারে একতা হইলেই, ব্রহ্মের দর্শনজন্য মহামহোৎসব অনুভূত হইয়া থাকে। ন্যায়শাস্ত্রে এইজন্যই বুদ্ধিকে পরব্রহ্মের বিভূতি বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। (তন্ত্রে এইজন্যই ভগবতী দুর্গা বা আদ্যাশক্তিকে বুদ্ধিরূপা ও জ্ঞানরূপা বলিয়া, অগ্রে জ্ঞান ও বুদ্ধির শোধন করিতে বলিয়াছেন।) ফলতঃ, মানুষ যে কষ্ট পায় ও পদে প[illegible] ব্যর্থমনোরথ হইয়া থাকে, বুদ্ধির [illegible] হার [illegible]

উপনিষদাদিতে [illegible] যে

বে[illegible] [illegible]র ক্রম; প্রথম সাত্ত্বিক, দ্বিতীয় রাজসিক [illegible] তৃতীয় তামসিক। তন্মধ্যে, শুদ্ধ নিষ্কাম উপাসনাকে সাত্ত্বিক সাধনা বলে।

অন্ধের ন্যায় চক্ষুর সঙ্কোচ হইয়া থাকে। পুনশ্চ, [illegible]নন্ত রাত্রি অন্ধকারে গাঢ়নিদ্রার পর প্রাতঃকালে সহসা গৃহের দ্বার মুক্ত করিয়া, দিবার আলোকে দৃষ্টি প্রসারিত করা যে সহজ হয় না, তাহাও অনেকে অবগত আছেন। ইত্যাদি যুক্তিতেই নিরপেক্ষ থাকিবার উপদেশ করা হইয়াছে।

একমাত্র বিশুদ্ধ প্রেম ও ভক্তিই এইপ্রকার উপাসনার অঙ্গ। বৈষ্ণবশাস্ত্রে এই প্রেম ও ভক্তির বিবিধ শাখা ও প্রশাখার উপদেশ করা হইয়াছে। যোগশাস্ত্রে প্রধানতঃ রাজস সাধনার ব্যবস্থা আছে। পূরক ও কুম্ভক প্রভৃতি কল্পিত উপায় সমস্ত ঐ সাধনার অঙ্গ; এবং তন্ত্রাদিতে তামসিক সাধনার সবিশেষ বিবরণাদি উল্লিখিত হইয়াছে। তন্মধ্যে সাত্বিক সাধনায় সদ্যোমুক্তি, রাজসিক সাধনায় ক্রমমুক্তি এবং তামসিক সাধনায় জন্মান্তরমুক্তি হইয়া থাকে। সাধক-ভেদে সাধনার এইপ্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়।

এক বারেই ব্রহ্মপদপ্রাপ্তিকে সদ্যোমুক্তি বলে। সদ্যোমুক্তির ক্রম পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে ক্রমমুক্তির বিষয় বর্ণিত হইতেছে। যোগবলে পৃথিবীর সমুদায় ঐশ্বর্য্য ভোগ করিয়া, ক্রমে ক্রমে পরব্রহ্মে লীন হওয়াকে ক্রমমুক্তি বলিয়া থাকে। পরমেষ্ঠিত্ব বা পরমৈশ্বর্য্য, সিদ্ধগণের রাজ্য, অষ্টবিধ সিদ্ধি এবং সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড বিচরণ ইত্যাদিকে ক্রমমুক্তির ফল বলে। বিষয়বাসনা ত্যাগ করিয়া, ইন্দ্রিয় সকলের সম্যক্ রূপে দমন ও দেহস্থ প্রাণ মন সকলের নিরোধ পূর্ব্বক ব্রহ্মভাবে অবস্থিতি করিলেই, এইপ্রকার ফলপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। বাহ্যে যে চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয় আছে, ইহাদের মূলস্থান বা কার্য্যশক্তি মনে, বাহিরে নহে। বাহিরে ইহা জড়পিণ্ড মাত্র। মনের চালনায় ইহাদের চালনা হয়। এই চালনাকেই প্রকৃত ইন্দ্রিয় বলে। চক্ষু প্রভৃতি বাহ্য দৃশ্যমান ইন্দ্রিয়াদি উহার প্রতিকৃতি বা তত্তৎ রূপের কল্পনা মাত্র। অথবা, এই দেহ যেমন আত্মার

আবরণ, সেইরূপ, চক্ষু প্রভৃতিও তত্তৎ ইন্দ্রিয়ের আবরণ। আবরণবিনাশে কখন আবৃতের বিনাশ হয় না। সুতরাং, যোগিপুরুষ ইচ্ছা করিলে, অনায়াসেই মনের সহিত ইন্দ্রিয়-দিগকে সঙ্গে লইতে পারেন। ইহার যুক্তি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ বীজ ভর্জ্জিত হইলে, যেমন তাহাতে অঙ্কুর উৎপন্ন হয় না, তদ্রূপ বাসনার ক্ষয় হইলে, বাহ্য বিষয়ে অনুরাগ জন্মে না। তখন দৃষ্টি থাকিতেও আর দর্শন হয় না, শ্রোত্র থাকিতেও আর শ্রবণ হয় না, মন থাকিতেও আর মনের কার্য্য হয় না। যোগী যখন সংসার ত্যাগ করেন, তখন এই রূপে বাসনার সংকোচ করিয়া, ইন্দ্রিয় সকলের বেগ রোধ করিয়া থাকেন। তৎকালে হৃদয়ের কেন্দ্রে তত্তৎ ইন্দ্রিয়শক্তি সকল একত্র নিহিত হইয়া থাকে। কেননা, ঐ কেন্দ্র হইতেই তাহাদের জন্ম হইয়াছে। সুতরাং যোগী পুরুষ ইচ্ছা করিলেই, সকল ইন্দ্রিয়ের কেন্দ্রস্বরূপ মনকে সঙ্গে লইতে পারেন। যে যাহার বশীভূত, সে তাহাকে অনায়াসেই আপনার অনুগামী করিয়া, যত্রতত্র গমন করিতে পারে, ইহা প্রতিপাদন করা বাহুল্য।

শরীর দ্বিবিধ; স্থূল ও সূক্ষ্ম। বাহ্য দৃশ্যমান দেহকে স্থূল দেহ বলে। এই স্থূলদেহবিনাশেও যাহার বিনাশ হয় না, তাহাকে সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহ বলে। এই সূক্ষ্ম দেহের অন্যতর নাম অন্তরাত্মা। বায়ুর সর্ব্বত্রই অবিহত গতিবিধি আছে, এইজন্য তাহাকে অন্তরাত্মা অর্থাৎ যোগি-গণের সূক্ষ্ম দেহ বলে। যোগিগণ এই বায়ুরূপী লিঙ্গ শরীর সহায়ে ব্রহ্মাণ্ডের যেখানে সেখানে বিচরণ করিতে

পারেন। ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপাদন করা যাইতে পারে যে, ভগবান্ সত্যপুরুষ সংসারের কোন পদার্থই অনর্থক সৃষ্টি করেন নাই। বিশেষতঃ, যে পঞ্চভূতের সমবায়ে আমাদের শরীরসংস্থান সম্পন্ন হইয়াছে, তাহা কখন অনর্থক কল্পনা হইতে পারে না। অর্থাৎ যে ব্যক্তি যেরূপে আপনার বুদ্ধি, বিদ্যা ও ক্ষমতাদির চালনা করিতে পারে, সে সেই রূপে বা তাহা অপেক্ষাও অধিক প্রকারে এই পঞ্চভূত দ্বারা স্ব স্ব অভিলাষ সিদ্ধ করিয়া লইতে পারে। (১) সামান্য বুদ্ধি দ্বারা যখন পঞ্চভূত সহায়ে ইত্যাকার নানাপ্রকার অদ্ভুতাকার ব্যাপারপরম্পরা সম্পন্ন হইয়া থাকে, যোগিগণ যোগবল দ্বারা তাহাদের সাহায্যে অসামান্য কার্য্য সকল সম্পাদন করিবেন, তাহা কোন্ ব্যক্তি অস্বীকার করিতে পারে? বিশেষতঃ, যেখানে বিদ্যা, তপস্যা, যোগ ও সমাধি এই সকলের একত্র সন্নিবেশ, সেখানে যে সমুদায় অভীষ্টই সুসিদ্ধ হইতে পারে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। বিদ্যাশব্দে বিচিত্র জ্ঞান, তপস্যাশব্দে ক্লেশসহিষ্ণুতা, যোগশব্দে কর্ম্মনিপুণতা, এবং সমাধিশব্দে দৃঢ়তর অধ্যবসায়, ইত্যাদি লৌকিক অর্থও বিচার করিলে, কার্য্যসিদ্ধি যে আপনা হইতেই হস্তগত হয়, তাহা প্রতিপাদন করা বাহুল্য।

(১) বর্ত্তমান কালের আবিষ্কৃত টেলিগ্রাফ্ বা তাড়িত বার্ত্তা এবং বাষ্পশকট ও বাষ্পযানাদি ইহার প্রমাণ। ব্যোমযান বা বেলুনে আরোহণ করিয়া যে, আকাশে খেচরের ন্যায়, অনায়াসে সাগরাদি লঙ্ঘনপূর্ব্বক বিবিধ দূরদেশ অতিক্রম করত অনায়াসে বিচরণ করা যায়, ইহাও ব্যক্তিমাত্রের পরিজ্ঞাত আছে ও হইতেছে।

যোগশাস্ত্রে ইহার ভিন্নপ্রকার অর্থ উল্লিখিত হইয়াছে। যথা, বিদ্যা অর্থাৎ যাহা দ্বারা পরোক্ষরূপী ঈশ্বরের স্বরূপ-পরিজ্ঞান হয়; তপঃ অর্থাৎ যাহা দ্বারা মন নির্ম্মল হইয়া, পরব্রহ্মদর্শন হয়; যোগ অর্থাৎ যাহা দ্বারা আত্মা পরমাত্মায় মিলিত হয় এবং সমাধি অর্থাৎ যাহা দ্বারা ইন্দ্রিয়দিগকে মনের সহিত প্রত্যাহরণ করিয়া, তন্ময়তা উপস্থিত হয়। সুতরাং, যোগেশ্বরগণ যে ব্রহ্মাণ্ডের আধিপত্য লাভ করিবেন, তাহা বিচিত্র নহে।

কর্ম্ম অপেক্ষা বিদ্যা প্রভৃতির সর্ব্বতোভাবে প্রাধান্য উপদিষ্ট হইয়াছে। অর্থাৎ কর্ম্ম দ্বারা স্বর্গাদি ক্ষয়শীল লোক সমস্ত প্রাপ্ত হইয়া থাকে; কিন্তু বিদ্যাদি দ্বারা অক্ষয়স্বরূপ পরব্রহ্মপদ লাভ হয়। পূর্ব্বেও ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, এই বর্ত্তমান শরীর কর্ম্মপরম্পরামাত্র; কর্ম্মের ক্ষয় না হইলে, ইহার ক্ষয় হয় না। বিদ্যা, তপ, সমাধি ও যোগ প্রধানতঃ এই চারিপ্রকার উপায়ে কর্ম্মের ক্ষয় হইয়া থাকে। এইজন্য, কর্ম্মকে তামসরূপে বর্ণনা করিয়াছে। বৈষ্ণব পদে এই কর্ম্মের সম্পর্ক নাই।

যাহারা আপনার জন্য কর্ম্ম করে, তাহাদের বাসনাবন্ধন উত্তরোত্তর দৃঢ়তর হইয়া থাকে; কিন্তু যাহারা ভগবানের দাস হইয়া, শুদ্ধ তাঁহারই কর্ম্ম করে, তাহাদের বন্ধনমোচন ও মুক্তিলাভ হয়। যোগ সমাধি প্রভৃতির অভ্যাস বা সাধন করাকেই ভগবানের কর্ম্ম বা দাসত্ব বলিয়া থাকে। সূর্য্যাদি যেমন শুদ্ধ লোকহিতের জন্য ইতস্ততঃ সর্ব্বদা পর্য্যটন করে, তদ্রূপ স্বার্থ ত্যাগ করিয়া, পরার্থ সন্ধান করাকেও,

ভগবানের কর্ম্ম করা বলিয়া থাকে। এইপ্রকার কর্ম্ম দ্বারা নিজকৃত কর্ম্মের ক্ষয় হয়। সুতরাং মুক্তির দ্বারও প্রশস্ত হইয়া থাকে।

কর্ম্ম দ্বারা যে গতি লাভ হয়, তাহা পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ খণ্ডিত। কিন্তু যোগ দ্বারা যে গতি লাভ হয়, কোন কালেই তাহার ক্ষয় নাই অথবা কোন দেশেই তাহার প্রতিঘাত হয় না।

পুনশ্চ, আকাশ, পাতাল, স্বর্গ, মর্ত্ত ইত্যাদি ব্রহ্মাণ্ডের অংশ সকল বর্ত্তমানে যেরূপ পরস্পর বহুদূরব্যবহিত বলিয়া বোধ হয়, বাস্তবিক তাহা নহে। ইহাদের পরস্পর এক-গৃহস্থিত ভিন্ন ভিন্ন কক্ষের ন্যায় অতি নিকটবর্ত্তিতা আছে। আকাশ হইতে পৃথিবীতে ও পৃথিবী হইতে আকাশে আরোহণ করিবার উপায়স্বরূপ সুষুম্না নামে জ্যোতির্ম্ময়ী নাড়ী সুখময় সোপানবৎ কল্পিত হইয়াছে। প্রত্যেক মনুষ্যের শরীরের বহির্ভাগে ঐ নাড়ীর মূল নিহিত আছে। তন্ত্রাদির মতে বিজ্ঞানকোষের অধিষ্ঠান পর্য্যন্ত উল্লিখিত মূলের বন্ধন আছে। স্থূলদৃষ্টিতে এই আকাশবহা নাড়ী লক্ষিত হয় না।

বৈশ্বানর শব্দে অগ্ন্যভিমানিনী দেবতা। ইনিই সূর্য্য-লোকের অধিষ্ঠাত্রী। অর্থাৎ ইনিই সমুদায় আলোকের কেন্দ্রস্থান। সুষুম্না নাড়ীর প্রবাহ বা সঞ্চার, সাগরে নদীর ন্যায়, ঐ কেন্দ্রে মিলিত হইয়া, ব্রহ্মপথ পর্য্যন্ত ধাবিত হইয়াছে।

এই বৈশ্বানর ক্ষেত্রের উপরে স্বয়ং নারায়ণ তারারূপে অধিষ্ঠিত আছেন। উহাকেই শিশুমারচক্র বলে। শিশুমার-

চক্রই জ্যোতিশ্চক্র। (যাহাকে চলিত কথায় সৌরজগৎ বলে)। আদিত্যাদি ধ্রুবপর্য্যন্ত সমুদায় জ্যোতিষ্ক ঐ চক্রে নিয়ত সম্বদ্ধ হইয়া আছে। কোন কোন মতে এই চক্র হইতেই পরম্পরাক্রমে তেজঃ, আলোক, জ্যোতিঃ ও প্রতিভা সঞ্চারিত হইয়া, সূর্য্যে, চন্দ্রে ও অন্যান্য আলোক ও জ্যোতিঃ পদার্থে সংক্রমিত হইয়া থাকে। যোগী পুরুষ এই চক্রস্থ আদিত্যাদি ধ্রুবপর্য্যন্ত সমস্ত পদেই আরোহণ করেন।

সূর্য্যাদি সমস্ত পদার্থই ঐ চক্রকে আশ্রয় করিয়া আছে। ষাট্‌কৌষিক শরীর লইয়া উহার ঊর্দ্ধে যাইতে পারা যায় না। মাতৃজ তিন ও পিতৃজ তিন সমুদয়ে এই ষট্‌ কোষ। তন্মধ্যে লোম লোহিত মাংস এই তিনটী মাতৃজ এবং স্নায়ু অস্থি মজ্জা এই তিনটী পিতৃজ। এই ষট্‌ কোষে নির্ম্মিত বলিয়া দেহকে ষাট্‌কৌষিক বলে। বেদে উল্লিখিত হইয়াছে, সর্ব্বথা শুদ্ধসত্ত্ব না হইলে, ঐ স্থান অতিক্রম করা যায় না। বিশেষতঃ, এই পার্থিব স্থূলদেহের তথায় সমাগম কোন মতেই সম্ভব হয় না। কেননা, তথায় পঞ্চভূতের আধিপত্য নাই। শুদ্ধ সত্ত্বগুণে উহার নির্ম্মাণ হইয়াছে। এইজন্য উহার রূপ অতিশয় সূক্ষ্ম ও যার পর নাই বিশুদ্ধ। ইহা প্রসিদ্ধই আছে যে, যাহা যেরূপ স্বভাবের, তাহা আয়ত্ত করিতে হইলে, তদনুরূপস্বভাববিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক। এইজন্য, তাহা অতিক্রম করিতে ইচ্ছা হইলে, সূক্ষ্ম নির্ম্মল শরীর গ্রহণ করা আবশ্যক। যোগবলে তাহাও প্রাপ্ত হওয়া যায়।

শিশুমারের উপরেই মহর্লোক। যাঁহারা অতিবিশুদ্ধ যোগবলে ব্রহ্মকে অবগত হইয়াছেন, তাঁহারা ঐ স্থানে বাস করেন। এইজন্য উহাকে ব্রহ্মবিদ্গণের স্থান বলিয়া থাকে। ফলতঃ. যোগের পরিণাম অত্যুচ্চ পদপ্রাপ্তি। যে পদে ইন্দ্রাদি স্বর্গবাসিগণেরও অধিকার নাই। যে পদে পার্থিব কোন বিকারই কোন রূপে প্রভুত্ব করিতে পারে না। মনুষ্য পিতা মাতা হইতে যে লোমমজ্জাদি প্রাপ্ত হয়, তৎসমস্তই ভৌতিক বিকার বলিয়া, অতিমাত্র ক্ষয়শীল। যে ব্যক্তি যোগসিদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে আর ঐপ্রকার ক্ষয়শীল-বস্তুপূর্ণ ক্ষয়শীল দেহ ভোগ করিতে হয় না। সমুদায় বিশ্ব যাহার আশ্রয়ে অবস্থিতি করিতেছে, এবং সূর্য্য চন্দ্রাদি যাহার সহায়তায় আলোকময় হইয়াছে, একমাত্র যোগ দ্বারা অনায়াসেই তাদৃশ উন্নত স্থানও অতিক্রম করিয়া, তাহার উপরি আরোহণ করা যায়। ভৃগু প্রভৃতি মহাপুরুষগণ ঐপ্রকার যোগবলে এইপ্রকার উন্নত পদ অধিকার করিয়াছেন। ফলতঃ, যাহাকে উন্নতির পর উন্নতি বলে এবং যাহাকে আত্মার উৎকর্ষ বলে; আবার, যে উন্নতি বা যে উৎকর্ষ উন্নতি ও উৎকর্ষের চরমসীমা, যোগী পুরুষ তাহাই প্রাপ্ত হয়েন।

দেহতত্ত্বে এইপ্রকার বর্ণিত হইয়াছে, "এই দেহ পৃথিবীস্বরূপ। পৃথিবীতে যে পঞ্চভূত আছে, এই দেহে তাহাই আছে। ইহার অভ্যন্তরে আকাশ। সুষুম্না দ্বারা এই আকাশে অনায়াসেই প্রবেশ করা যায়। বিজ্ঞানময় কোষ এই আকাশের উপরিস্থ বৈশ্বানর। উহা সর্ব্বদাই আপনার

তেজে প্রজ্বলিত হইতেছে। উহার উপরে আনন্দময় কোষ বিষ্ণুচক্ররূপে বিচিত্র শোভা বিস্তার করিয়াছে। ইহার উপরে ব্রহ্মরন্ধ্রে ব্রহ্মপুর পরম পূজনীয় মহর্লোক(১) রূপে সর্ব্বদা বিরাজমান হইতেছে। অতিবিশুদ্ধ বুদ্ধির স্বরূপ ভৃগু প্রভৃতি বিবুধগণ ঐ স্থানে সর্ব্বদাই বিচরণ করেন। এই বুদ্ধিই আদিদেব ভগবানের সাক্ষাৎ বিভূতি। যোগ দ্বারা এই বিভূতিসাধন হইলেই, ভগবানের সাক্ষাৎকার লাভ হয়। যোগী পুরুষ সর্ব্বদাই ঐপ্রকার সাক্ষাৎ-কারজন্য মহামহোৎসব অনুভব করিয়া থাকেন। যোগ ব্যতিরেকে অন্যরূপে উহা লাভ কারা যায় না। ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ অতিমাত্র যোগসিদ্ধ হইয়াছেন। এইজন্য তাঁহা-দিগকে সাক্ষাৎ বিভূতি বলে।” (২)

(১) তন্ত্রাদিতে প্রকারান্তরে উল্লিখিত হইয়াছে, যে, বেদে যাহাকে ভর্গঃ বলিয়াছে, তাহার অন্যতর নাম মহঃ। যিনি এই সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড প্রসব করিয়াছেন এবং গায়ত্রীরূপে যিনি সমস্ত বেদের আদিম স্থান লাভ করিয়াছেন, সেই আদ্যাশক্তির বিভূতিকে মহঃ বলে। যে স্থানে ঐ মহঃ অর্থাৎ শক্তি-বিভূতি নিত্য বিরাজ করেন, তাহার নাম মহর্লোক। বাহুল্য হইবে বলিয়া আর অধিক বিবৃত করা গেল না।

(২) এইরূপ প্রথিত আছে, যে, ভগবানের হৃদয়ে ভৃগুর পদচিহ্ন বিরাজমান হইয়া থাকে। ইহার যুক্তি সুস্পষ্ট। অর্থাৎ, পদ শব্দে স্থান বা অধিষ্ঠান; চলিত কথায় যাহাকে চরণ বা পা বলে, পদ শব্দের সেরূপ অর্থ নহে। এক্ষণে ইহা অনায়াসেই প্রমাণ করা যাইতে পারে যে, ভৃগু যোগবলে ভগবানের হৃদয়ে পদ অর্থাৎ স্থান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক, তিনি উহাতে চরণবিন্যাস করেন নাই। ভৃগুর কথা কি, যাঁহারা যোগসিদ্ধ

একাদশ পটল।

পারমেষ্ঠ্যপদ। (১)

ইষ্টাদির বিয়োগজন্য যে দুঃখ, তাহাকে শোক বলে। পারমেষ্ঠ্য পদ প্রাপ্ত হইলে, সমুদায় ইষ্টসংগ্রহ হইয়া

হইয়া, শুদ্ধসত্বময় হইবেন, তাঁহারাই ভগবানের হৃদয়ে পদচিহ্ন রাখিতে পারিবেন। ইহাই শাস্ত্রকারগণের উপদেশ। ফলতঃ, যখন সূক্ষ্মশরীর না হইলে, বিষ্ণুর সান্নিধ্য প্রাপ্ত হয় না, তখন আবার চরণকল্পনা কি রূপে সঙ্গত হইতে পারে? অর্থাৎ স্থূল দেহের ন্যায়, সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ শরীরের করচরণাদির কখন সদ্ভাব কল্পনা করা যাইতে পারে না। যাহাতে করচরণাদি আছে, তাহাকে স্থূল দেহ এবং যাহাতে করচরণাদি নাই, তাহাকেই সূক্ষ্ম বা লিঙ্গ দেহ বলিয়া থাকে। ভৃগু প্রভৃতি বিবুধগণ ঐ প্রকার করচরণাদিবর্জ্জিত সূক্ষ্মদেহসম্পন্ন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং, প্রাকৃত ভৌতিক দেহের ন্যায়, তাঁহাদের করচরণাদি থাকা কখনই সম্ভবপর হইতে পারে না।

(১) ভগবান্ ব্রহ্মার যে পদ, সচরাচর তাহাকেই পারমেষ্ঠ্যপদ বলে। এই পারমেষ্ঠ্যপদও লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহা দ্বারা সংসারের ক্ষণভঙ্গুরত্ব দৃঢ়তর প্রমাণ হয়। অর্থাৎ, যে পিতামহ ব্রহ্মা হইতে এই সংসারের সৃষ্টি হইয়াছে, তাঁহার পদও যখন স্থায়ী নহে, তখন সংসারের কথা আর কি বলিব? সংসার সর্ব্বদাই মৃত্যুর আসন্ন ও অবসন্ন হইয়া আছে। সুতরাং ইহার অন্তর্গত কোন পদার্থই স্থায়ী নহে। তন্ত্রাদিতে শবসাধনপ্রসঙ্গে ইহা বিশিষ্টরূপে প্রতিপাদিত হইয়াছে। শবসাধনের উদ্দেশ্য অতি মহৎ। উহা দ্বারা সংসারের ক্ষণভঙ্গুরত্ব, বিষয়ের অসারত্ব, দেহের জড়পিণ্ডস্বরূপত্ব, তাহার অনুষঙ্গী সুখহর্ষাদির পরিণামপরিবাদিত্ব এবং দুঃখশোকেরও অকিঞ্চিৎকরত্ব প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইয়া থাকে। কোন বিষয় প্রত্যক্ষ দর্শন পূর্ব্বক তাহাতে আহত বা প্রতিহত না হইলে, মানুষের সহজে চৈতন্য হয় না। এইজন্য, আচার্য্যগণ শবসাধনাদি ব্যাপারপরম্পরায় সিদ্ধির উপদেশ করিয়াছেন। মহামতি ব্যাসদেব এইজন্যই বলিয়াছেন' —

থাকে, কোন কালে কোন রূপেই তাহার অভাব হয় না। সুতরাং সেই অভাবজন্য দুঃখেরও কোন রূপে, আবির্ভাব হইতে পারে না। সংসারে এই শোক পদে পদেই প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। আজি বিষয়নাশ, কালি অর্থহানি; আজি পুত্রের মৃত্যু, কালি পিতৃবিয়োগ; আজি বন্ধুবিনাশ, কালি বান্ধবহানি; আজি সম্পদসংগ্রহ, কালি বিষমবিপত্তি; আজি হর্ষলাভ, কালি বিষাদবেগের ভয়াবহ দুর্ভরতা ইত্যাদি শতশত রূপে শতদিকে সংসারে ইষ্টবিয়োগ ও অনিষ্টসংযোগ হইয়া, যারপরনাই শোকের প্রাদুর্ভাব ঘটিয়া থাকে। কি উচ্চ কি নীচ, কি ক্ষুদ্র কি মহৎ, কি ধনী কি দরিদ্র, কি দুর্ব্বল কি প্রবল, কি বিদ্বান্ কি মূর্খ, এমন কোন মনুষ্য নাই, যাহার জীবন কোন না কোন রূপে এই শোকের গুরুতর আঘাতে জর্জ্জরিত না হয়। মানুষ নিতান্ত অন্ধ, হৃদয়শূন্য ও মূঢ় বলিয়া, তাহার ইহাতে ভ্রূক্ষেপ হয় না। পারমেষ্ঠ্য পদে ইহার সম্পর্কও নাই।

জরা বলিলে, বৃদ্ধাবস্থার স্মরণ হয়; এবং মৃত্যু আসন্ন হইয়াছে, উপলব্ধি হয়। মনুষ্যলোকে অনেকেই বৃদ্ধাবস্থা না হইতেই, যৌবনকালেও অকালিক জরায় আক্রান্ত হইয়া

"অহন্যহনি ভূতানি গচ্ছন্তি যমমন্দিরম্।
শেষা জীবিতমিচ্ছন্তি কিমাশ্চর্য্যমতঃপরম্॥"

বাস্তবিক, পিতামাতা পুত্রকন্যাকে একদণ্ড না দেখিলে অথবা ক্ষণমাত্র ক্রোড়ে না করিলে, মহাপ্রলয় দর্শন করিয়া থাকেন। কিন্তু সেই প্রাণাধিক প্রীতিময় পুত্রকন্যাকে শ্মশানানলে জলাঞ্জলি দিয়া আসিয়া, আপনাদিগকে যেন অমর ভাবিয়া পুনরায় পূর্ব্বের ন্যায় অসার বিষয়ভোগে প্রবৃত্ত হয়েন। ইহা অপেক্ষা অন্ধতা ও আশ্চর্য্য আর কি আছে! হরিঃ হরিঃ।

থাকে। গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্তরূপ সমাবেশ না থাকা সর্ব্বদা চিন্তা, উদ্বেগ, মনোহানি, আশাভঙ্গ ও শোকপ্রাচুর্য্য এবং ইন্দ্রিয়বিষয়ের অতিমাত্রে সেবা ইত্যাদি কারণে অকালিক জরার আক্রমণ দেখিতে পাওয়া যায়। পারমেষ্ঠ্যপদে এই সকলের সম্পর্ক নাই।

পঞ্চভূতের পরিহারকেই সচরাচর মৃত্যু বলে। তদ্ব্যতীত প্রমাদ ও মোহকেও জ্ঞানীরা মৃত্যু নামে নির্দ্দেশ করেন। কোন কোন মতে ভগবানকে বিস্মৃত হইয়া থাকাই যথার্থ মৃত্যু। সংসারে এইপ্রকার মৃত্যু সর্ব্বক্ষণই ঘটিয়া থাকে। আজি যাহাকে ধনে মানে কুলে শীলে সর্ব্বাংশেই উন্নত দেখিলাম, কালি তাহার নাম পর্য্যন্ত আর শুনিতে পাওয়া যায় না। পারমেষ্ঠ্যপদে ইহার লেশমাত্র নাই। তথায় অপ্রমাদ, অমরতা, অজরা, অশোক, অভয় ইত্যাদি সর্ব্বদা সাক্ষাৎকারে বিরাজ করিতেছে।

সংসারে নানা প্রকারে পদে পদেই ব্যাকুলতা উপস্থিত হয়। বায়ুর যেমন অবিরাম গতি, আকাশের যেমন অবিরাম স্থিতি, ব্যাকুলতাও তেমন অবিরামে সংসারে ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতেছে। কেহ উদরের জন্য, কেহ শিশ্নের জন্য, কেহ বিষয়ের জন্য, কেহ শোকের জন্য, কেহ দুঃখের জন্য, কেহ সুখের জন্য, কেহ নিদ্রার জন্য, এই রূপে নানা কারণে লোকমাত্রেই ব্যাকুল হইয়া, বিব্রত হইয়া, সর্ব্বদাই ভ্রমণ করিয়া থাকে। পদ্মপত্রস্থ জলের ন্যায়, তরঙ্গপতিত নৌকার ন্যায়, বায়ুবেগসমাক্রান্ত কদলীর ন্যায়, কাহারও কোন রূপে স্থিরতা নাই। এইপ্রকার দুর্নিবার ব্যাকুলতা, এই অনন্ত-

বিস্তৃত আকাশের সহিত অনন্ত-বিস্তৃত হইয়া আছে এবং এই বায়ুর সহিত সর্ব্বত্র অব্যাহত বিচরণ করিতেছে। যত দিন সংসার, তত দিন এই ব্যাকুলতা; ইহার বিরাম হইবে কি না, বোধ হয় না। কিন্তু পারমেষ্ঠ্যপদে ইহার কিছুমাত্র সম্পর্ক নাই।

যেখানে ক্রোধ, হিংসা ও দ্বেষ আছে, এবং কাম, লোভ ও মোহ আছে, সে সংসারের আবার উদ্বেগের অভাব কি? কে না জানে, সংসার সসর্প গৃহ স্বরূপ। সসর্প গৃহে বাস করিলে, নিত্য উদ্বেগ ভোগ হইয়া থাকে, ইহাই বা কে অবগত নহে? কুরুপাণ্ডববংশে একজন দুর্য্যোধন ও একজন শকুনি ছিল; তাহাতেই তাহার কত অনিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু সংসারে প্রায় দেশশুদ্ধ দুর্য্যোধন ও প্রায় দেশশুদ্ধ শকুনি। সুতরাং, উদ্বেগও দেশব্যাপী হইবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? পারমেষ্ঠ্যপদে ইহার সম্পর্ক নাই। (১)

---

(১) যোগসিদ্ধ হইলে যে, অশোক, অজর, অমর, অব্যাকুল ও নিরুদ্বেগ-পদ প্রাপ্ত হয়, তাহাই এখানে সংকেতে উপদেশ করা হইল। পুনশ্চ, সংসার যে শোক, মৃত্যু, জরা, উদ্বেগ ও ব্যাকুলতার জন্মভূমি এবং দুঃখ, বিষাদ, প্রমাদ, অবসাদ, ও ভয়শঙ্কার বিহারগৃহ, তাহাও প্রতিপাদিত হইল।

আবার, ভগবানের ধ্যানই যে একমাত্র সুখের হেতু ও অমৃতের সেতু, তাহাও এখানে সুস্পষ্ট প্রতীত করা গেল। যে ব্যক্তি ভগবানের স্মরণ মনন করে না, সে অভয় ও অমৃতের মধ্যবর্ত্তী হইলেও, দুর্নিবার মনঃপীড়া ভোগ করিয়া থাকে। অধিক কি, না জানিয়া ভগবানের ধ্যান করিলেও, সুখ নাই। যে সকল যোগী ঐপ্রকার অবগত নহেন, তাঁহারা পারমেষ্ঠ্য পদে অধিরূঢ় হইলেও, ঐপ্রকার মনঃপীড়া ভোগ করেন। ইহা অপেক্ষা ভয়ানক শাস্তি আর কি হইতে পারে? একমাত্র পারমেষ্ঠ্যপদই ঐপ্রকার শান্তি-প্রদানের ধর্ম্মাধিকরণ।

দ্বাদশ পটল।

যোগমাহাত্ম্য।

ব্রহ্মলোকপ্রাপ্ত প্রাণিগণের ত্রিবিধ গতি হইয়া থাকে। যাঁহারা পুণ্যের উৎকর্ষ বশতঃ ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা কল্পান্তে স্ব স্ব অর্জ্জিত পুণ্যের তারতম্য অনুসারে বিশেষ বিশেষ মুক্তি সম্ভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহারা হিরণ্যগর্ভাদির উপাসনাবলে ব্রহ্মলোকে গমন করেন, তাঁহারা ব্রহ্মার সহিত মুক্ত হইয়া থাকেন। যাঁহারা ভগবানের উপাসক, তাঁহারা স্ব ইচ্ছায় ব্রহ্মাণ্ড ভেদ করিয়া, বৈষ্ণব পদে আরোহণ করেন। শাস্ত্রে সেই ভগবদ্ভক্তগণের ব্রহ্মাণ্ডভেদপ্রকার উল্লিখিত হইয়াছে। ইহার প্রক্রিয়া বা ক্রম এই, যথা; ঈশ্বর প্রকৃতিকে আশ্রয় করিলে, সেই প্রকৃতির অংশবিশেষ হইতে মহত্তত্ত্বের উৎপত্তি হয়। মহত্তত্ত্বের অংশে অহঙ্কার জন্মে। অহঙ্কারের অংশে শব্দতন্মাত্র দ্বারা আকাশ, আকাশের অংশে স্পর্শতন্মাত্র দ্বারা বায়ু, বায়ুর অংশে রূপতন্মাত্র দ্বারা তেজঃ, তেজের অংশে রসতন্মাত্র দ্বারা জল, জলের অংশে গন্ধতন্মাত্র দ্বারা পৃথিবী উৎপন্ন হয়। এই সকল পঞ্চ মহাভূতাংশ মিলিত হইয়া, চতুর্দ্দশ-ভুবনময় বিরাট-শরীর উৎপাদন করে। এই বিরাট দেহ পঞ্চাশ কোটি-যোজন-বিস্তৃত। যাহাকে অণ্ডকটাহবিশেষ বলিয়া থাকে, সেই পৃথিবী ঐ বিরাট দেহের প্রথম আবরণ এই প্রথম আবরণের পরিমাণ কোটি যোজন, কোন কোন মতে পঞ্চাশৎ কোটি যোজন। দ্বিতীয় আবরণ অপরি-

ণত জলাংশ, প্রথম আবরণের দশগুণ বিস্তৃত। তৃতীয় আবরণ অপরিণত তেজোংশ, দ্বিতীয় আবরণের দশগুণ বিস্তৃত। চতুর্থ আবরণ বায়ু, পঞ্চম আবরণ আকাশ, ষষ্ঠ আবরণ অহঙ্কার, সপ্তম আবরণ মহত্তত্ত্ব। ইহারা প্রত্যেকে উক্ত রূপে পরস্পর যথাক্রমে দশগুণ বিস্তৃত। অষ্টম আবরণ প্রকৃতি। ইহার বিস্তৃতির ইয়ত্তা নাই। যোগী পুরুষ এই সপ্ত আবরণ ভেদ করিয়া, অষ্টম আবরণ প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হইয়া, যেরূপে আনন্দময় পুরুষকে লাভ করত আনন্দময় হন, তাহাই যথাক্রমে বর্ণিত হইতেছে।

ইহা সকলেই জানেন, যাহাতে উৎপত্তি, তাহাতেই লয়। যোগধর্ম্মের অনুসরণ করিলে, এইপ্রকার লয় অনায়াসেই সুসম্পন্ন হয়। যোগের পরিণাম একমাত্র অভয় ও অমৃত। শত দিকে শত শত বজ্র প্রাদুর্ভূত হইয়া, সমুদয় পৃথিবী রসাতলে নিহিত করুক, অথবা সাক্ষাৎ কৃতান্ত করাল জিহ্বা প্রকাশ করিরা, এক উদ্যমে সংসার গ্রাস করিতে উদ্যত হউক; অথবা স্বয়ং প্রলয় দ্বাদশ আদিত্য ও সংবর্ত্তক সমভিব্যাহারে সম্মুখে আসিয়া আস্ফালন করুক, যোগিপুরুষ কিছুতেই ভীত বা শঙ্কিত হয়েন না। একমাত্র সত্যস্বরূপ সর্ব্বপ্রভু ভগবানে তদীয় চিত্ত, আমিষে বড়িশবৎ, গাঢ়তর বিদ্ধ থাকাতে, তিনি হিমালয় অপেক্ষাও অচল হইয়া, পৃথিবী অপেক্ষাও সহিষ্ণু হইয়া, সাগর অপেক্ষাও গম্ভীর হইয়া এবং সূর্য্য অপেক্ষাও তেজস্বী হইয়া, সমুদায় বিঘ্নবিপত্তি অনায়াসেই পরিহার করেন। ইহাই যোগের স্বভাব ও পরিণাম।

এই স্থূলদেহ ত্যাগ করিয়া, পরমাত্মময় হইতে ইচ্ছা হইলে, যোগসিদ্ধ হওয়া আবশ্যক। তাহা হইলে, আর সংসারে কোন প্রকারে আসিতে হয় না। সংসারে বারংবার যাতা-য়াতকেই নরকপরম্পরা বলিয়া থাকে। চারিপ্রকার উপায়ে সচরাচর এই নরকপরম্পরার পরিহার হয়। তন্মধ্যে যোগচর্য্যা প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে।

যোগশাস্ত্রে সবিশেষ বিচার পূর্ব্বক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, যে, রূপরসাদি ইন্দ্রিয়বিষয় সকল মহাতপা মহাপ্রভাব সংশিতব্রত মহর্ষিরও মনে বিকার সঞ্চার করিয়া থাকে। ঈশ্বরসিদ্ধির যতপ্রকার অন্তরায় আছে, রূপরসাদি তৎসর্ব্বা-পেক্ষা প্রধান। সুরূপা স্ত্রীতে মোহিত না হয়, সুন্দর গন্ধে আকৃষ্ট না হয়, সুমিষ্ট রসে বশীকৃত না হয়, সুখময় স্পর্শে অভিভূত না হয়, সুস্বর সঙ্গীতাদিতে অপহৃত না হয়, এরূপ ব্যক্তি সংসারে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। যাহার মন ঐ সকল সামান্য বোধে ত্যাগ করিয়া, একমাত্র ভগ-বানে তত্তৎ ইন্দ্রিয় সহিত গাঢ়তর সন্নিবিষ্ট হয়, সেই ব্যক্তিই আনন্দময় হইয়া থাকে। যোগী পুরুষ সর্ব্বদাই এই-প্রকার ভূমানন্দ অনুভব করেন। পরমাত্মরূপ পরম রস-পান, তদীয় দিব্যরূপদর্শন, তদীয় সহবাসে অপূর্ব্ব স্পর্শসুখ অনুভব, তদীয় বিচিত্র আলাপরূপ শব্দসুখভোগ ও তদীয় পাদপদ্মপরাগসেবা রূপ অভূতপূর্ব্ব গন্ধসুখ উপযোগ করিয়া, তাঁহার সমুদায় ইন্দ্রিয়ই এককালে পরিতৃপ্ত হইয়া থাকে। তাঁহাতে তাঁহার আনন্দসন্দোহ, উচ্ছলিত পারাবারের ন্যায়, সর্ব্বদাই পূর্ণ হইয়া, অন্তঃকরণ পুলকিত করে। সংসারে

এই আনন্দের তুলনা নাই। স্বর্গের আধিপত্যলাভেও এই আনন্দের বিনিময় করিতে ভ্রমেও ইচ্ছা হয় না। ইহারই নাম ভূমানন্দ। ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ, নারদ প্রভৃতি দেবর্ষিগণ, বিশ্বামিত্র প্রভৃতি রাজর্ষিগণ, বশিষ্ঠ প্রভৃতি ব্রহ্মর্ষিগণ এইপ্রকার ভূমানন্দ সর্ব্বদাই ভোগ করিয়া থাকেন। (১)

পুনশ্চ, পুত্রকে প্রীতিভরে ও স্নেহভরে ক্রোড়ে করিয়া পিতা মাতা তাহার স্পর্শসুখে অভিভূত হইলেন; কিন্তু সে সুখ তাঁহাদের কদিন? এই রূপে, গন্ধ বল, রস বল, রূপ বল, শব্দ বল, মানুষ যাহাতেই অভিভূত ও হতজ্ঞান হয়, সে সকলই বা কয়দিন? প্রখরকিরণের প্রখর কিরণে স্বল্পজল সংকীর্ণ জলাশয় যেমন দেখিতে দেখিতে শুষ্ক হইয়া যায়, সেইরূপ কালবশে ঐ সকল কোথা হইতে কি প্রকারে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তাহা জানিতে বা ভাবিলেও বুঝিতে, পারা যায় না; কিন্তু ভগবানের সঙ্গলাভ জন্য ঐপ্রকার ভূমানন্দের স্বভাব সেরূপ নহে। উহার অক্ষয়, অনন্ত ও অপার উৎস ঈশ্বররূপ মহাসাগরের মহামূলে

(১)। শঙ্করাচার্য্য প্রভৃতি যোগাচার্য্যেরা উপদেশ করেন, যাহাদের পুত্র নাই, এই আনন্দ তাহাদের পুত্রজন্য প্রীতির উদ্ধার করে; যাহাদের বিভব নাই, এই আনন্দ তাহাদের বিভব জন্য সুখের সঞ্চার করে; যাহাদের বন্ধু বা বান্ধবাদি নাই, এই আনন্দ তাহাদের বন্ধু বান্ধবাদি জন্য দিব্য সুখের সদ্ভাব সাধন করে; যাহাদের পিতা মাতা নাই, সহায় সম্পত্তি নাই, এই আনন্দ তাহাদের পিতামাতাদির স্থানীয় হইয়া থাকে। ফলতঃ এই ভূমানন্দই সংসারের সর্ব্বস্ব। মানুষ অন্ধ ও অজ্ঞান বলিয়াই অসার পার্থিব আনন্দের সংগ্রহ করিতে স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করে। তাঁহাতে কোনকালেই সুখের লেশমাত্রও প্রাপ্ত হয় না।

এরূপ গাঢ়ভাবে সন্নিবদ্ধ, যে মহাপ্রলয়ে সমুদায় ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংস পাইলেও, উহার ধ্বংস হইবার সম্ভাবনা নাই!

প্রকৃতি অগ্রে ঈশ্বর হইতে প্রাদুর্ভূত হয়। এই জন্য ইহাকে আদিশক্তি বলে। প্রকৃতি বা স্বভাবের গঠন না হইলে, গুণ সকলের গঠন হয় না। লোকে যদি কোন ব্যক্তি অসৎ-প্রবৃত্তি হয়, তাহার অন্যান্য গুণ সমুদয় তাহাতে আচ্ছন্ন হইয়া যায়। এইপ্রকার যুক্তিতেই প্রকৃতিকে গুণ সকলের লয়স্থান বলা হইয়াছে। প্রকৃতি লইয়াই ঈশ্বর, আবার ঈশ্বর লইয়াই প্রকৃতি। পুনশ্চ, পুরুষ যেমন স্ত্রীর সহযোগে স্ত্রী-পুরুষান্তর উৎপাদন করে, তদ্রূপ ঈশ্বর যাহাতে অধিষ্ঠিত হইয়া, সংসারপরম্পরা আবিষ্কার করেন, তাহাকেই প্রকৃতি বলিয়া থাকে। তন্ত্রাদিতে এই প্রকৃতিকে মহামায়া বলা হইয়াছে। কোন কোন স্থলে, মায়া বলিয়া এই প্রকৃতির উল্লেখ দেখা যায়। কেহ কেহ ভগবানের অনির্ব্বচনীয় ইচ্ছাকে মায়া ও প্রকৃতি দুই নামে আখ্যাত করেন। কেহ কেহ ইহার নাম যোগমায়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কেহ কেহ ইহাকে ঈশ্বরের সত্তা বলেন। কেননা, ঈশ্বর যে আছেন, ইহা দ্বারাই তাহা বুঝিতে পারা যায়। যোগবলে এই প্রকৃতি জয় বা আয়ত্ত হইয়া থাকে।

যোগের পরিণাম নির্ব্বিকার আনন্দ, ইহা সবিশেষ বিচার পূর্ব্বক মীমাংসিত হইয়াছে। যাহা কিছুই নহে, তাহাকে উপাধি বলে। উপাধি কল্পনামাত্র। সুতরাং উপাধি বলিলে, পঞ্চভূত ও পঞ্চভূতের উৎপন্ন শব্দস্পর্শাদি বিষয় সমস্ত এবং অহঙ্কারাদি সমেত সমস্ত সংসার বুঝিতে

হয়। যেমন তর্কালঙ্কার ও ন্যায়চঞ্চু প্রভৃতি উপাধি সকলের পরিহার না করিলে, প্রকৃত ব্যক্তি পরিচয় হয় না অর্থাৎ শুদ্ধ তর্কালঙ্কার বলিলে যেমন সমস্ত তর্কালঙ্কারোপাধিক ব্যক্তিকেই বুঝাইয়া থাকে, সেইরূপ পঞ্চভূতাদিরূপ উপাধি সকলের পরিহার না হইলে, প্রকৃতি প্রাপ্ত হওয়া যায় না। পুনশ্চ, স্বরূপলাভ করিলে, সকলেরই আনন্দ হইয়া থাকে, ইহা প্রতিপাদন করা বাহুল্য। কোন বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করিয়া, তাহা বুঝিতে পারিলে, মনে আনন্দসঞ্চার হইয়া থাকে, ইহা সকলেই জানে। ইহারই নাম স্বরূপানন্দ।

সমস্ত বস্তুই ভগবৎস্বরূপ ঈশ্বর হইতে আসিয়াছে। অতএব সমস্তই সেই ভগবানে লয় পাইবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ঈশ্বরের স্বরূপ প্রাপ্ত না হইলে, ঈশ্বরে লয় পাওয়া যায় না। এইপ্রকার স্বরূপপ্রাপ্তিকেই ভাগবতী গতি বা ঈশ্বরসারূপ্য কহিয়া থাকে। ইহারই অন্যতর নাম বৈষ্ণবপদ। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে যে, বৈষ্ণবপদে সত্ত্ব রজ তমঃ প্রভৃতি প্রধান অপ্রধান ভেদে সংসারের উৎপত্তির প্রতি কারণ সকলের কিছুমাত্র প্রভুত্ব নাই। সুতরাং, ভাগবতী গতি লাভ করিলে যে, সংসারে আসিতে হয় না, ইহা বলা বাহুল্য।

যাঁহারা প্রকৃতি বশ করিয়াছেন, তাঁহারাই ভাগবত, তাঁহারাই মুক্ত, তাঁহারাই মায়াজয়ী এবং তাঁহারাই পুনর্জ্জন্মবিবর্জ্জিত।

ত্রয়োদশ পটল।

ঈশ্বরের অস্তিত্বকথন।

কার্য্য দেখিয়া, কারণের অনুমান হয়। ভগবান্ হরি যে আছেন, তাহা মানুষের বুদ্ধি প্রভৃতি বৃত্তি সকল সাক্ষী প্রদান করিতেছে। অর্থাৎ, বুদ্ধি প্রভৃতি জড়স্বরূপ। উহাদের স্বয়ং কার্য্য করিবার ক্ষমতা নাই। ভগবান্ অন্তর্যামিরূপে স্বকীয় চৈতন্যাংশে তাহাদিগকে উজ্জীবিত করেন, বলিয়াই, তাহারা স্বকীয় কার্য্যসাধনে সমর্থ হয়। ইহারই নাম অনুমাপক (অর্থাৎ যাহা দ্বারা ভগবানকে ঐ রূপে কারণ-স্বরূপ অনুমান করা যায়) লক্ষণ। ফলতঃ, ভগবান্ আছেন, কি, নাই, ইহা জানিবার জন্য ইতস্ততঃ করিবার আবশ্যকতা নাই। স্ব স্ব অন্তর্ব্বৃত্তি সমুদায় পরীক্ষা করিলেই, আপনা হইতে জানিতে পারা যায়। তিনি হৃদয়ের বস্তু, হৃদয়েই আছেন। এ কথা আপনার হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করিলেই, জানিতে পারা যাইবে। মহাভাগবত প্রহ্লাদ আপনার হৃদয়কেই জিজ্ঞাসা করিয়া, এবিষয় অবগত হইয়াছিলেন, তজ্জন্য তাঁহাকে বেদাদি অধ্যয়নের আয়াস স্বীকার করিতে হয় নাই। ভাবিয়া দেখিলে, হৃদয়কেই বেদ কহে। কেননা, যাহাতে ব্রহ্মজ্ঞান উপস্থিত হয়, তাহাকে বেদ বলে। হৃদয়ের আলোচনা করিলে, ব্রহ্মরূপী ভগবানকে জানিতে পারা যায়। অতএব হৃদয়কেও বেদ বলে। (১)

(১) ভাগবতের প্রথমেই লেখা আছে, ভগবান্ হৃদয়যোগে ব্রহ্মাকে বেদ প্রদান করেন। ইহাতে বুঝা যায় যে, হৃদয় হইতেই বেদের সৃষ্টি হইয়াছে।

হৃদয় প্রকৃত বেদ, বেদ তাহার প্রতিকৃতি। এ কথা বলিলে, বোধ হয়, অসঙ্গত হইবে না যে, বেদের সমস্তই রূপক। অর্থাৎ হৃদয়কে বেদরূপে কল্পনা করিয়া, ঐ হৃদয়ের অন্তর্গত এক একটী বৃত্তি, প্রবৃত্তি ও উপবৃত্তিকে ইন্দ্র, বায়ু ও অগ্নি প্রভৃতি এক একটী দেবতা রূপে সাজান হইয়াছে। হৃদয়ে ধর্ম্মাদি যে সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তি আছে, তাহাদিগকে উৎকৃষ্টস্বরূপ দেবতা রূপ এবং যে সকল অনুরাগাদি নিকৃষ্ট বৃত্তি ও প্রবৃত্তি আছে, তাহাদিগকে দৈত্য ও দানবগণের স্বরূপ প্রদান করা হইয়াছে। ইহা সকলেই জানেন, হৃদয়ের চারিপ্রকার অবস্থা। যথা, মন, বুদ্ধি, চিত্ত ও অহঙ্কার। বেদেরও চারি-প্রকার বিভাগ, যথা, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ব। ইত্যাদি ক্রমে বিচার করিলে, হৃদয়ে ও বেদে কিছুমাত্র প্রভেদ দেখিতে পাওয়া যায় না।

পুনশ্চ, বেদের চারি গুণ। যেমন, সত্ব, রজঃ, তমঃ ও তমঃসত্বাদিমিশ্রিত গুণ। হৃদয়েরও তদ্রূপ প্রধানতঃ চারি গুণ। চারি বেদ বিচার করিলে, যেমন স্বপ্ন, জাগ্রৎ, সুষুপ্তি ও মুক্তি জানিতে পারা যায়, হৃদয়ের উক্তরূপ চারিপ্রকার বিভাগ পর্য্যালোচনা করিলেও তদ্রূপ এই অবস্থাচতুষ্টয় পরিজ্ঞাত হয়।

পরীক্ষিৎ প্রেম ও ভক্তিকেই সংসারের সারসর্ব্বস্ব জানিয়া, সেই প্রেম ও ভক্তির প্রকৃত পাত্র কে, ইহা জানিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই, প্রেম ভক্তির সেই প্রকৃত পাত্রে আত্মসমর্পণ করিয়া, জলে জলবৎ মিলিত হইয়া, সমুদায় পাপ তাপ প্রক্ষালন পূর্ব্বক আত্মাকে শুদ্ধ করেন। তাহা হইলে, ব্রহ্মহত্যার দুরন্ত অগ্নিজ্বালা নির্ব্বাণ হইয়া, আত্মা সুস্থ হইবে। কেন না, প্রেমভক্তি অগ্নিরও অগ্নিস্বরূপ। ইহাতে সংসারের সমুদায় অগ্নিই মিলিত হইয়া যায়। ধ্রুব এই প্রেম ভক্তিতে বিমাতার বিদ্বেষরূপ দুরন্ত জ্বালা নিক্ষেপ করিয়া নির্ব্বাণ করিয়াছিলেন; প্রহ্লাদও এই প্রেম ভক্তিতেই পিতার তাড়নারূপ দারুণ অগ্নি নির্ব্বাপিত করিয়াছিলেন। পরীক্ষিতও ঐ রূপে দুরন্ত জ্বালা নির্ব্বাপিত করিতে চাহিয়াছিলেন। ভগবানই এই প্রেম ভক্তির একমাত্র আধার। সকল দেশে সকল কালে সকল অবস্থাতেই তাঁহার শ্রবণ, মনন ও কীর্ত্তন করিবে।

ইহা সকলেই জানেন, সম্পদ্ বিপদ্ সকল অবস্থাতেই মানুষের বিবিধ দুশ্চিন্তা উপস্থিত হইয়া থাকে। যে চিন্তায় মনের ব্যাকুলতা ও অস্বস্থতা

জন্মে তাহাকে দুশ্চিন্তা বলে। সর্ব্বচিন্তাবিনাশী ভগবানের মনন করিলে, এই দুশ্চিন্তার লয় হইয়া থাকে। ইহাও সকলেই জানেন যে, ভাল কথা কীর্ত্তন বা ভাল বিষয় শ্রবণ করিলে, লোকমাত্রেরই চিত্ত প্রফুল্ল ও আত্মা প্রসন্ন হয়। ভগবান্ অপেক্ষা ভাল বিষয় এবং তাঁহার গুণানুবাদ অপেক্ষা ভাল কথা সংসারে আর কি আছে? এই জন্যই বলিয়াছেন যে,

"নিবৃত্ততর্ষৈরুপগীয়মানাদ্ভবৌষধাৎ শ্রোত্রমনোভিরামাৎ।
ক উত্তমশ্লোকগুণানুবাদাৎ পুমান্ বিরজ্যেত বিনা পশুঘ্নাৎ॥"

অর্থাৎ মুক্ত ব্যক্তিরা যাহা গান করেন, যাহা শ্রবণ করিয়া মুমুক্ষুগণ মুক্তিলাভ করেন এবং বিষয়িগণ যাহা শ্রবণ করিয়া শ্রবণ মনের পরম তৃপ্তি প্রাপ্ত হয়; আত্মঘাতী ব্যতিরেকে আর কোন ব্যক্তিই ভগবানের তাদৃশ গুণ কীর্ত্তনে বিরত হয় না।

ফলতঃ, যে ব্যক্তি উদ্বন্ধনাদি দ্বারা আত্মহত্যা করে, তাহাকে প্রকৃত আত্মঘাতী বলে না; কিন্তু যে ব্যক্তি ভগবানের গুণকীর্ত্তনে বিরক্ত হয়, তাহাকেই আত্মঘাতী বলে। ইহাই শাস্ত্রের অভিপ্রায়। পুনশ্চ, ইহা দ্বারা ইহাও উপপন্ন হয় যে, ভগবানের গুণ কীর্ত্তন করিলে আত্মলাভ হয়। আত্মলাভ শব্দে আত্মার স্বস্থতা অথবা অমরতা। পরীক্ষিৎ ব্রহ্মকোপা-নলে দহ্যমান হইয়া অন্তরে বাহিরে অতিমাত্র ব্যাকুল ও স্বস্তিশূন্য হইয়াছিলেন। তিনি দেখিলেন এবং স্পষ্টই বুঝিয়াছিলেন যে, ধন জন, বিষয় বিভব, বল পরাক্রম সংসারের কিছুই কিছু নহে। তদ্দ্বারা ঐ ব্যাকুলতার উপশম হয় না। এইজন্য তিনি বৈরাগ্য অবলম্বন পূর্ব্বক জাহ্নবীতটে প্রায়োপবেশন করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য এই, জাহ্নবী ভগবানের পাদপদ্ম হইতে বিনির্গত হইয়াছেন। সুতরাং তদীয় আশ্রয়ে হৃদয়ের দুরন্ত তাপ বিগলিত হইয়া যাইবে। তাঁহার অপর উদ্দেশ্যও ছিল। সেই উদ্দেশ্য হরিভক্তি ও হরিপ্রেমলাভ। সৎসঙ্গে থাকিলে, সদ্বিষয়ের প্রাপ্তি হয়, ইহা সনাতন নিয়ম। এই নিয়মে তাঁহার আন্তরিক কামনার সিদ্ধি হইল। অর্থাৎ, শুকদেবের সহিত সাক্ষাৎ এবং সেই সাক্ষাতের ফলে তিনি পরম অভীষ্ট প্রেমভক্তি প্রাপ্ত হইলেন। অথবা,

"যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

চতুর্দ্দশ পটল।

সুখস্বরূপনিরূপণ।

ভগবতী কহিলেন, বৎস! সর্ব্বদা সুখে থাকিব, কখনও দুঃখ পাইব না, এইপ্রকার ইচ্ছা লোকমাত্রেরই আছে। কিন্তু কি উপায়ে সেই সুখ লাভ হইতে পারে, তাহা কাহারই জানা নাই। অনেকে ধনমানকেই সুখ বলিয়া থাকে এবং তজ্জন্য স্বতঃ পরতঃ চেষ্টা করে। কিন্তু ধন মান কখনও পূর্ণ বা নিত্য সুখ নহে। এবিষয়ে ভুক্তভোগী লোককে জিজ্ঞাসা করিলেই উত্তর পাওয়া যায়। অনেকে উত্তম স্ত্রীপুত্রাদিকেই সুখ বলিয়া থাকে। কিন্তু পরীক্ষা দ্বারা দেখা গিয়াছে, তাহাও সুখ নহে। এই রূপে সাংসারিক সুখমাত্রেই সুখের ছায়া মাত্র। মরীচিকা যেমন জল নহে, সুতরাং তাহাতে তৃষ্ণা নিবারণ করিতে গেলে, তৃষ্ণার আরও বৃদ্ধি ও অবশেষে প্রাণ পর্য্যন্ত সংশয় হইয়া থাকে, সাংসারিক সুখেও তেমনি সুখের আশ মিটাইতে গেলে, দুঃখেরই সঞ্চার হইয়া থাকে। তবে কি সংসারে সুখ নাই? উত্তর, সংসারে যেমন সুখ আছে, স্বর্গেও সেরূপ নাই। (ধ্রুব, প্রহ্লাদ, নারদ, চৈতন্য প্রভৃতি এ বিষয়ে নিদর্শন।) ফলতঃ, ঈশ্বর-ভক্তের সুখই প্রকৃত সুখ।

মন ও বুদ্ধি উন্নত হওয়াই, মনুষ্যত্বের প্রধান চিহ্ন। সঙ্কুচিত মন অন্ধকারময় গভীর গর্ত্ত স্বরূপ। ঐরূপ গর্ত্তে যেমন সূর্য্যকিরণের প্রবেশ না থাকাতে, কখন আলোক প্রকাশ পায় না, সঙ্কুচিত মনেও সেইরূপ জ্ঞানালোকের

অপ্রকাশজন্য প্রকৃত সুখের সম্পর্ক নাই। সেই জন্য নীতিকারেরা বলিয়াছেন, যাহার বিদ্যা নাই, বুদ্ধি নাই এবং যাহার মনও অতিসঙ্কুচিত, সে নিশ্চয়ই পশু।

আবার, ইহাও বুঝিতে হইবে যে, প্রশস্ত ও উন্নত মনেই কর্ত্তব্য চিন্তা হইয়া থাকে। ইহকালের যেমন কর্ত্তব্য চিন্তা করিতে হয়, পরকালেরও সেইরূপ করা বিধেয়। কারণ, ইহকালের যে কিছু সম্পর্ক, মৃত্যুর পর আর তাহার নামমাত্র থাকে না। বাস্তবিক, ভাবিয়া দেখিলে, মৃত্যুই মনুষ্যের স্বভাব, বলিয়া সুস্পষ্ট বোধ হয়। সেইজন্য জীবন অপেক্ষা যেমন মৃত্যুর প্রাধান্য কীর্ত্তিত হইয়াছে, তেমনি ইহকাল অপেক্ষা পরকালেরও প্রাধান্য শাস্ত্রে উল্লিখিত আছে। তথাহি, মনুষ্যের জীবন যেমন অস্থায়ী বা ক্ষণভঙ্গুর; উহাতে সুখের ভাগও তেমনি অল্প। অথবা, অস্থায়িতাই মহা অসুখ। মশক প্রভৃতি ক্ষুদ্র কীট সকল যেমন অল্পভাগ্য, মনুষ্য যদি সেইরূপই হয়, তাহা হইলে কীটজন্মে ও মনুষ্যজন্মে বিশেষ কি ?

অনেকে বলিতে পারেন, মৃত্যু অতিক্রম করা সহজ নহে। সে কথা সত্য বটে, কিন্তু তাই বলিয়া উপায় সত্ত্বেও, কষ্ট ভোগ করা মনুষ্যের ন্যায়, বিশিষ্ট প্রাণীর কর্ত্তব্য হয় না।

পঞ্চদশ পটল।

ভগবান সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ।

ভগবতী কহিলেন, পুত্রাদির ভজনা করিলে যেমন তুচ্ছ ফল লাভ হয়, ভগবান্ ভিন্ন অন্যান্য দেবতার আরাধনায় তেমনি তাহার অধিক ফললাভের কোন সম্ভাবনা নাই। তথাহি, ব্রহ্মতেজ ভিন্ন অন্য কিছু প্রদান করিতে ব্রহ্মার ক্ষমতা নাই। পুনশ্চ, বেদেও সকলের অধিকার নাই। সুতরাং ব্রহ্মতেজ প্রাপ্ত হওয়া সকলেরই ভাগ্যে ঘটিয়া উঠে না। আবার, ভাবিয়া দেখিলে, ব্রহ্মা স্বয়ং বেদকর্ত্তা নহেন। সুতরাং নিকৃষ্ট দেবতার আরাধনা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দেবতার উপাসনাই শ্রেয়স্কর।

পক্ষান্তরে, ইন্দ্রিয়ের পটুতায় অনেক সময়ে যে, কর্ম্মে প্রগাঢ় আসক্তি বশতঃ হিতে বিপরীত হইয়া থাকে, তাহা সকলেই জানেন। অথবা, ইন্দ্রেরও যখন পতন আছে, তখন তাঁহার উপাসনায় পতন ভিন্ন অন্য ফল প্রাপ্তির সম্ভাবনা কি? এই ইন্দ্র উল্লিখিত ইন্দ্রিয় সকলের অধিষ্ঠাতা।

ভক্তিশাস্ত্রে সংসারকে বন্ধন স্বরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। সন্তান সন্ততি এই বন্ধনের গ্রন্থি স্বরূপ। সুতরাং, দক্ষাদি প্রজাপতির উপাসনায় একমাত্র বন্ধনেরই দৃঢ়তা হইয়া থাকে, ইহা প্রতিপাদন করা বাহুল্য। কেননা, দক্ষাদির উপাসনায় কেবল সন্তান সন্ততির বৃদ্ধি হয়।

শ্রী কখন লোকের মন জানেন না। এইজন্য ইহাঁর উচ্চ নীচ বিচার নাই এবং এইজন্যই কেহ ইহাঁর প্রিয়

হইতে পারে না। বামাচার মোহাচ্ছন্ন লোকেই তাঁহার প্রতি একান্ত আসক্ত হইয়া থাকে।

ধন এই সংসারের, পরলোকের নহে। সুতরাং ধনদাতা বসুগণের উপাসনায় পরকালের কাজ হইতে পারে না।

যে গুণে সংহার হয়, প্রলয় হয়, সেই তমোগুণ রুদ্রগণের স্বভাব। সুতরাং, বীর্য্য যে, যুদ্ধাদি লোকক্ষয়কর ঘটনা বা ব্যাপার সকলের উত্তেজক এবং তজ্জন্য একমাত্র শ্বাপদচেষ্টিত ভিন্ন আর কিছুই নহে, তাহাও অনুভব করিতে হইবে।

আমার প্রচুর অন্নপান সংস্থান হউক, তদ্দ্বারা আমি হৃষ্টপুষ্ট হইব, ইত্যাদি কামনা পশুচেষ্টিতমাত্র। ইহা দ্বারা কখনও পারমার্থিক উন্নতি হয় না। সুতরাং অন্নদাত্রী অদিতির উপাসনা আত্মার উন্নতিকল্পে কখনও প্রমাণ হইতে পারে না। আর, স্বর্গেরও ক্ষয় আছে, দেবগণেরও অসুরগণের সহিত স্পর্দ্ধাদি জন্য বিষম অসূয়া ও ঈর্ষ্যাদি আছে, যে ঈর্ষ্যা ও অসূয়ায় আত্মার নিত্য ক্ষয় হইয়া থাকে, কোন্ বুদ্ধিমান্ পুরুষ জানিয়া শুনিয়া তাদৃশ ক্ষয়শীল স্বর্গের জন্য তাদৃশ মিশ্র-প্রকৃতি দেবগণের উপাসনা করিতে পারেন? এই জন্য মহামতি প্রহ্লাদ ও রাজা অম্বরীষ স্বর্গে যাইতে অভিলাষী হয়েন নাই। অথবা, রাজ্য যে, বিবাদময়, তাহা সকলেই জানেন, এবং সাধ্যগণ যে কর্ম্ম-মাত্রের প্রবর্ত্তক, তজ্জন্য তাঁহাদের উপাসনায় যে নিত্য বন্ধন সংঘটিত হয়, তাহাও শাস্ত্রকারগণ সবিশেষে প্রতি-পাদন করিয়াছেন।

আমার দীর্ঘ জীবন হউক, ইত্যাদি প্রার্থনা সুখের বটে।

কিন্তু যে জীবনের হ্রাস বৃদ্ধিতে সংসারের কোন হ্রাস বৃদ্ধি নাই, তাহা জড় জীবন অপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ নহে। ঐরূপ জীবন আর মৃত্যু একই কথা। অশ্বিনীকুমারেরা ঐরূপ আয়ুমাত্র প্রদান করিয়া থাকেন, আয়ুর উন্নতির সহিত, তাঁহাদের কোন সম্পর্ক নাই।

মহাভাগ তুম্বুরু দেবর্ষি নারদকে বলিয়াছিলেন, আমি পুষ্টির প্রার্থী নহি এবং তজ্জন্য পৃথিবীরও উপাসনা করিতে আমার অভিলাষ নাই। কেননা, দেখিতে পাওয়া যায়, কুকুর পৃথিবীর উপাসনা না করিয়া, পরের প্রদত্ত উচ্ছিষ্টাদিতেই সর্ব্বদা পুষ্টি ভোগ করিয়া থাকে। এই রূপ, নরকেও যে পুষ্টি লাভ করা দুষ্কর নহে, কোন্ বিদ্বান্ পুরুষ একবারেই চতুর্ব্বর্গের দ্বার রোধ করিবার জন্য তাদৃশ পুষ্টির প্রয়াসী হইয়া, পৃথিবীর উপাসক হইতে পারেন?

ইচ্ছা করিলে যাহার বৃদ্ধি হয় না, হিংসা করিলে যাহার ক্ষয় হয় না এবং কালবশে পর্য্যুষিত পুষ্পের ন্যায়, যাহার আর গৌরব থাকে না, সেই সৌন্দর্য্য কখন বস্তু মধ্যেই গণ্য হইতে পারে না। সুতরাং বস্তুহীন গন্ধর্ব্বগণেরই নিকট তাহার প্রার্থনা শোভা পায়। এইরূপ অন্যত্র বুঝিয়া লইতে হইবে।

কোন্ নির্দ্দিষ্ট বিষয়ের কামনা থাকুক বা না থাকুক, অথবা যশ, মান, ধন, ধর্ম্ম, অর্থ ইত্যাদি সকল বিষয়েরই কামনা থাকুক, কিম্বা একমাত্র মোক্ষেরই অভিলাষ থাকুক, উদারবুদ্ধি ব্যক্তি দৃঢ়তর ভক্তিযোগ সহকারে সেই পরমপুরুষ ভগবানেরই আরাধনা করিবেন। একমাত্র

ভগবানের উপাসনা দ্বারাই প্রকৃত যশ ও ধর্ম্ম সঞ্চিত হইয়া থাকে।

যাহা দ্বারা বাসনাবন্ধন ছিন্ন হইয়া, জ্ঞান বিজ্ঞানের আবির্ভাবে পরমাত্মজ্যোতির সাক্ষাৎকার লাভ ও একবারেই মুক্তি হইয়া থাকে, তাহাকেই প্রকৃত বৈরাগ্য বলে। বৈরাগ্যের উদয় হইলে, যশ, অর্থ, কাম, আরোগ্য, ইন্দ্রিয়-শক্তি, ধন, মান, তেজঃ এই সকল সাংসারিক বিষয়ের আর আবশ্যকতা হয় না। সুতরাং বৈরাগ্য যেমন সকলের শ্রেষ্ঠ, সেইরূপ সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ পরম পুরুষ ভগবানের আরাধনায় তাহার সঞ্চয় হইয়া থাকে।

ভগবান্ সকল দেবতার শ্রেষ্ঠ। কেননা, তিনি সকল কামনাই পূর্ণ করেন। একাধারে এইরূপ সর্ব্বসিদ্ধি-দাতৃত্বগুণ অন্য কোন দেবতারই নাই। কারণ, উপরে যেরূপ উল্লিখিত হইল, তাহাতে স্পষ্টই প্রতীতি জন্মে, ঐ সকল দেবতা, বিশেষ বিশেষ কামনা পূরণ করিয়া থাকেন। মোক্ষদানে কাহারই অধিকার নাই। ইহাও বুঝিতে হইবে যে, সাংসারিক কোন বিষয়ই মোক্ষের হেতু হইতে পারে না। পুনশ্চ, বুদ্ধি উদার না হইলেও, ভগবানের আরাধনা করা সহজ হয় না। উদার শব্দে ইষ্টানিষ্ট, ভাবাভাব অথবা আত্মপর ইত্যাদি পরস্পর বিরুদ্ধ বিষয়ে সমদর্শিতাবিশিষ্ট, এইপ্রকার অর্থ প্রতীতি করিতে হইবে। কেননা, ভগবান্ কাহারই পক্ষপাতী নহেন। সুতরাং তাঁহাকে পাইতে হইলে, সর্ব্বতোভাবে পক্ষপাত বিসর্জ্জন করা কর্ত্তব্য।

আবার, শুদ্ধ সমদর্শী হইলেই, তাঁহার সাধনা হয় না। ভক্তিশূন্য সমদর্শিতা জড়তা মাত্র। যেমন কাণ চক্ষু কোন কার্য্যের হয় না, যেমন মূর্খ পুত্র পুত্রের নামমাত্র, অথবা যেমন পুস্তকগত বিদ্যা শোভা-মাত্র, সেইরূপ ভক্তিশূন্য সমদর্শিতা বিড়ম্বনামাত্র। ভক্তিতে হৃদয়ে পূর্ণানন্দের বিকাশ হয়। অর্থাৎ জিহ্বা যেমন রোগাদিতে দূষিত হইলে, কোন বস্তুরই স্বাদ পাওয়া যায় না, সেইরূপ ভক্তি না থাকিলেও পূর্ণানন্দের অনুভব হয় না। ফলতঃ লোকে যে তিক্ত, কটু, কষায় ইত্যাদির স্বাদ উপলব্ধি করিয়া, আত্মাকে তৃপ্ত করে, জিহ্বাই তাহার একমাত্র সাধন। সেইরূপ, সমদর্শিতায় যে সুখ অনুভূত হয়, ভক্তিই তাহার হেতু। এইজন্য পরমপুরুষ ভগবানের আরাধনায় একমাত্র ভক্তিরই প্রাধান্য ও সাধকতা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

তুমি নিশ্চয় জানিও, যদি ইন্দ্রাদি অন্যান্য দেবতার আরাধনায় ভগবানের প্রতি ভক্তির উদ্রেক না হয়, তাহা হইলে, তাহা আরাধনাই হইতে পারে না। প্রথমে অক্ষর পরিচয় না করিলে, পুস্তকাদি পাঠ করা যায় না, বলিয়া অগ্রে ব্যঞ্জন ও স্বর সকলের পরিচয় করিতে হয়। সুতরাং যে বর্ণপরিচয়ে পুস্তক সকল নিঃসন্দেহে পাঠ করা যাইতে পারে না, তাহাকে কখনই প্রকৃত বর্ণপরিচয় বলিতে পারা যায় না। সেই রূপ, ভগবানে যদি ভক্তিযোগ সাধন করিতে না পারে, তাহা হইলে, অন্যান্য দেবতার আরাধনাও প্রকৃত আরাধনা হইতে পারে না।

ভক্তিশাস্ত্রে প্রধানতঃ দুইপ্রকার উপাসক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। প্রথম পূর্ণোপাসক; দ্বিতীয় বিশিষ্টোপাসক। অর্থাৎ যে ব্যক্তি শুদ্ধ বেদে ব্যুৎপন্ন, তাহাকে বৈদিক, যে ব্যক্তি শব্দশাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন, তাহাকে শাব্দিক, যে ব্যক্তি ব্যাকরণে বিশারদ, তাহাকে বৈয়াকরণিক বলে। কিন্তু যে ব্যক্তিতে একাধারে বেদাদি সমুদায় শাস্ত্রেরই বিশিষ্টরূপ জ্ঞান আছে, তাহাকেই প্রকৃত শাস্ত্রী বলিয়া থাকে। ফলতঃ, শাস্ত্রের এক এক শাখায় ব্যুৎপত্তি কখন শাস্ত্রীর পরিচায়ক হইতে পারে না। সেই রূপ, যে ব্যক্তি, বিশেষ বিশেষ দেবতার আরাধনায় পটুতা লাভ করিয়াছে, তাহাকে বিশিষ্টোপাসক কহিয়া থাকে, এবং যে ব্যক্তি ঐ রূপে বিশেষ বিশেষ আরাধনায় পটুতালাভ করিয়া, ভগবৎসাধনা করিয়াছেন, তাঁহাকেই পূর্ণোপাসক বলিতে পারা যায়। ভক্তিরসিকগণ সংক্ষেতে বলিয়াছেন, নদী প্রভৃতি যেমন চরমে একমাত্র মহাসাগরেই লীন হয়, সেইরূপ, একমাত্র ভগবানেই সকল দেবতার অন্তর্ভাব বা পর্য্যবসান হইয়া থাকে। সুতরাং, একমাত্র সাগরে বিচরণ করিলেই যেমন সমুদায় জলাশয়ে বিচরণ করা সিদ্ধ হয়, সেইরূপ, একমাত্র ভগবানের উপাসনাতেই পূর্ণোপাসক উপাধি লাভ করিতে পারা যায়; বিশিষ্ট উপাসনা না হইলেও, কোনরূপ ক্ষতি হয় না। (এবিষয়ে ধ্রুব প্রহ্লাদ প্রভৃতি প্রসিদ্ধ সাধকগণ একমাত্র নিদর্শন। তাঁহারা অন্য কোন দেবতার উপাসনা না করিয়াই সিদ্ধ হইয়াছেন।)

বাস্তবিক, ভগবৎ-নামসঙ্কীর্ত্তনে একবারেই হৃদয়ের দ্বার

প্রশস্ত হয়, আত্মার দ্বার বিমুক্ত হয়, স্বর্গ ও মোক্ষের দ্বার আবিষ্কৃত হয়, শান্তি ও সুখের দ্বার' বিবৃত হয়। ফলতঃ সংসারের যাহা কিছু সুখ সৌভাগ্য, সমস্তই সুগম ও সুখময় পন্থা পরিজ্ঞাত ও অধিগত হইয়া থাকে। মহর্ষি ভাগুরি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ঈশ্বরকে না জানে, সে বাস্তবিকই পশু, অথবা পশু অপেক্ষাও অধম। তাহার আত্মা নাই, যদি থাকে, তাহা হইলে, তাহা একবারেই শুষ্ক হইয়া গিয়াছে। তাহার মন নাই, যদি থাকে, তাহা হইলে তাহা একবারেই শূন্য হইয়া গিয়াছে। তাহার চৈতন্য নাই, যদি থাকে, তাহা হইলে তাহা একবারেই ভ্রষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার জ্ঞান নাই, যদি থাকে, তাহা হইলে, তাহা একবারেই বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে। তাহার বুদ্ধি নাই, যদি থাকে, তাহা হইলে তাহা একবারেই বিগলিত হইয়া গিয়াছে। তাহার বিচার নাই যদি থাকে, তাহাহইলে তাহা এক বারেই ব্যবস্থাশূন্য হইয়া গিয়াছে। এইরূপে যে ব্যক্তি ঈশ্বরজ্ঞান শূন্য সে প্রকৃতরূপ বুদ্ধি বিদ্যা, জ্ঞান বিজ্ঞান ও বিচারাদিসম্পন্ন হইলেও সর্ব্বথা শূন্য, শুষ্ক ও নিরসভাবাপন্ন, এ বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। তিনি আরও নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যে, যেখানে ঈশ্বরজ্ঞান, সেইখানেই নিত্য সুখ ও নিত্য সন্তোষ বিরাজমান। তপোবনে গমন করিয়া অবলোকন কর, ঋষিগণ পূর্ণকুটীরে বাস করিয়া ফল মূল ভক্ষণ করিয়া, চর্ম্মবল্কল পরিধান করিয়া, অনশন ও অর্দ্ধাশন করিয়া অথবা বায়ুমাত্র জলমাত্র ও জীর্ণপত্র মাত্র ভক্ষণ করিয়া সর্ব্বদা

অবিচ্ছিন্ন সুখসচ্ছন্দে বাস করিতেছেন। তাঁহাদের কোন প্রকার চিন্তা নাই, অবসাদ নাই, ভাবনা নাই, ইহার কারণ কি? একমাত্র ঈশ্বরজ্ঞানই তাঁহাদিগকে ঐরূপ সুখসচ্ছন্দ প্রদান করিয়াছে।

ফলতঃ, ঈশ্বরজ্ঞান ভ্রষ্ট হইলে, দেবগণ স্বর্গের দ্বার রুদ্ধ করেন। ধর্ম্ম আর আশ্রয় করিয়া দিব্যসুখ, নিত্য সন্তোষ প্রদান করেন না, শান্তি আর প্রিয়তমা পত্নীর ন্যায় অঙ্কশায়িনী হইয়া কোনরূপে হৃদয়ের প্রীতি সম্পাদন করে না, সত্য আর অবলম্বন দান করিয়া নির্ম্মলসুখ ও নিত্য সন্তোষ বিধান করে না। বলিতে কি, তুমি যদি ঈশ্বরজ্ঞান ভ্রষ্ট হও, তাহা হইলে তোমার কলেবর এই মৃত্তিকা অপেক্ষাও অসার হইবে। এবং মৃত্যুর উপর অবশ্যই কৃমিকীট অথবা তাহা অপেক্ষাও অতি নিকৃষ্ট যোনিতে পতিত হইবে। অথবা দুরন্ত নরকের সেই সুভীষণ অগ্নিকুণ্ডে পতিত হইয়া অহরহ দহ্যমান হইবে। এ দাহ যন্ত্রণার আর কোনকালেই বিরাম হইবে না। পুনশ্চ, তুমি যদি ঈশ্বর-জ্ঞান ভ্রষ্ট হও, তাহা হইলে মৃত্যুর উপর তোমার প্রাণ ও তোমার আত্মা উভয়েই শূন্য হইয়া অনবরত শূন্যে শূন্যে বিচরণ করিয়া পদে পদেই অবসন্ন হইবে। বলিতে কি, তুমি যদি ঈশ্বরজ্ঞান ভ্রষ্ট হও, তাহা হইলে এই সর্ব্বভূত-ধাত্রী ধরিত্রী তোমারে সর্ব্বশূন্য ভাবিয়া কোনমতেই বহন করিবেন না। সর্ব্বভূতরসায়ন সলিলও তোমারে সর্ব্বশূন্য ভাবিয়া কোনমতেই আপ্যায়িত করিবে না এবং সকলের আধার এই অনন্তবিস্তৃত আকাশও তোমারে

সর্ব্বশূন্য ভাবিয়া, কোন মতেই আর আশ্রয় প্রদান করিবে না।

ষোড়শ পটল।

উলূপীর উপাখ্যান।

ভগবতী পার্ব্বতী ভগবান্ অগস্ত্যকে এইপ্রকার উপদেশ করিতেছেন, এমন সময়ে সকললোকপ্রকাশক কমলিনী-নায়ক অস্তাচলচূড়া অবলম্বন করিলেন। বিহঙ্গমগণের কোলাহলে চতুর্দ্দিক্ পূর্ণ হইয়া উঠিল, পূর্ব্বদিকের রাগ-বর্দ্ধিত হইল। কৈলাসে কোন কালেই অন্ধকার নাই। তথায় নিত্য চন্দ্র উদিত হয়েন। দিবাকর অস্তমিত হইলে, সন্ধ্যার সমভিব্যাহারেই ভুবনভূষণ পূর্ণচন্দ্রমা সকল-লোক-মনোহারিণী কৌমুদীলীলায় দিগ্‌বিদিক্ যুগপৎ আপ্যায়িত ও আলোকিত করিয়া, বিচিত্র বেশে কৈলাসাকাশে সমুদিত হইলেন। দেবী পার্ব্বতী সন্ধ্যাদর্শনে স্বামিসেবাসমুৎসুক হইয়া, প্রস্তাবিত কথার উপসংহারপূর্ব্বক মৃদু মধুর উদার বাক্যে মহাভাগ অগস্ত্যকে কহিলেন, তাত! সম্প্রতি সন্ধ্যা সমুপস্থিত। আমার আর অবসর নাই। অতএব তুমি সন্ধ্যাবন্দনানন্তর এই সিদ্ধ শবরীর নিকট কথাশেষ শ্রবণ কর। আমার প্রসাদে এই উলূপীর দিব্যজ্ঞান সঞ্চিত হইয়াছে এবং যোগবিষয়ে সবিশেষ দক্ষতা ও উপদেশক্ষমতারও আবির্ভাব হইয়াছে। সুতরাং এই শবরী অনায়াসেই তোমার অভিলাষপূরণে সমর্থ হইবে।

এই বলিয়া দেবী প্রস্থান করিলে, মহামতি অগস্ত্য যথাবিধি সন্ধ্যাকৃত্যসমাধানান্তে সবিশেষ ভক্তি সহকারে শবরীর সন্নিহিত হইলেন। মহর্ষিকে দেখিবামাত্র মনস্বিনী উলূপী অতিমাত্র সম্ভ্রমসহকারে তৎক্ষণাৎ গাত্রোত্থান করিয়া, যথাবিধি প্রণামবিধি সমাহিত করিলেন। এবং মহর্ষি প্রতিপ্রণামে সমুদ্যত হইলে, সাদরে কহিলেন, ব্রহ্মন্! আপনাদের ন্যায়, তপঃসিদ্ধ পুরুষগণ, আমাদের ন্যায় ক্ষুদ্র জনের ব্রহ্মস্বরূপ। বিশেষতঃ, আমি অতিনীচ বংশে জন্মগ্রহণ করিয়াছি; সর্ব্বদাই আপনাদের কৃপা ও আশীর্ব্বাদের পাত্রী। ভগবতী নিজগুণে অনুগ্রহ করেন, বলিয়াই এই পবিত্র স্থানে পবিত্র সমাজে বাস করিতে সমর্থা হইয়াছি। অতএব প্রণাম করিয়া, আমারে অপরাধিনী বা দুষ্কৃতিভাগিনী করিবেন না। যেজন্য আসিয়াছেন, আজ্ঞা করিয়া, অনুগৃহীত করুন। আপনার ন্যায় সাধুর সমাগমলাভ বহু সৌভাগের বিষয়, সন্দেহ নাই। যে দিন সাধুসঙ্গ না হয়, সে দিনই বৃথা। যেখানে সাধুগণের বাস, সেই খানেই মোক্ষ ও স্বর্গ, সন্দেহ নাই। সংসারে দ্বিহস্ত ও দ্বিপদ বিশিষ্ট মানুষের অভাব নাই; একমাত্র সাধুরই অভাব দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব আপনার ন্যায়, সাধুগণের সর্ব্বথা জয় হউক।

শবরীর এই বিনয়গর্ভ উদার বাক্যে মহর্ষি অগস্ত্য যেমন প্রীত হইলেন, তদ্রূপ তাঁহার জঘন্যযোনিতা শ্রবণ করিয়া, পরম বিস্মিত হইলেন। অনন্তর অতিমাত্র কৌতূহলপরতন্ত্র হইয়া, সুমধুর বাক্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসিলেন, শুভে,

তুমি যেরূপ সর্ব্বলোকবরণীয় উন্নত পদে প্রতিষ্ঠিত ও সর্ব্ব লোকসেবনীয় সন্মার্গে প্রবৃত্ত হইয়াছ, তোমার এই সর্ব্বকালমনোহারিণী পরমসদ্ভাবশালিনী বচনরচনা সর্ব্বথা তাহার অনুরূপ, সন্দেহ নাই। উন্নতির ফল বিনয়, ইহা সকলেই জানে। কোন কালেই এই নিয়মের ব্যভিচার হয় না। যে যে স্থলে ব্যভিচার লক্ষিত হয়, সে সে স্থলে ইহাই বুঝিতে হইবে, যে, ঐ উন্নতি প্রকৃত উন্নতি নহে; অবনতির পূর্ব্ব লক্ষণ বা সাক্ষাৎ অবনতি। যেমন, প্রদীপ-নির্ব্বাণের পূর্ব্বে উজ্জ্বল হয় এবং সূর্য্য অস্তগমনের পূর্ব্বে সমধিক রাগবিশিষ্ট হয়েন।

তপঃসিদ্ধা উলূপী মহর্ষির এই সগৌরব বাক্যে সাতিশয় লজ্জিতা হইয়া, বদনমণ্ডল অবনত করিলে, মহামতি অগস্ত্য পুনরায় পরম সমাদরে কহিলেন, কল্যাণি! সকল বিস্ময়ের অবধি ও সকল আশ্চর্য্যের নিদান, অনন্তকৌশলী বিধাতার বিচিত্র সৃষ্টিতে কিছুই নূতন বা কিছুই আশ্চর্য্য নহে। আশ্চর্য্য কেবল, বুঝিতে না পারা বা দেখিতে না পাওয়া। অতএব তুমি অতীব নীচ পদ হইতে অতীব উচ্চ পদে অধি-রোহণ করিয়াছ, ইহা কোন মতেই বিস্ময়ের বিষয় নহে। প্রত্যুত, ঐরূপে উচ্চ পদে অধিরূঢ় না হওয়াই, বিস্ময় ও লজ্জার কথা। অতএব আমি তোমার উচ্চপদ-প্রাপ্তিতে কোন মতেই বিস্ময় প্রকাশ করিতেছি না। আমার বিলক্ষণ ধারণা আছে, উন্নত বা উচ্চপদাধিষ্ঠিত হওয়াই মানুষের স্বভাব এবং তদিতরত্বই পশুর লক্ষণ। অধুনা, আমার ইহাই একমাত্র জিজ্ঞাস্য, তুমি কিরূপে এরূপ পবিত্র-

পদ প্রাপ্ত হইলে, সমুদায় সবিশেষ কীর্ত্তন করিয়া, আমার কৌতূহল নিবৃত্ত কর এবং লোকদিগেরও উপকার সমাহিত কর। কারণ, তাহারা তোমার সাধুদৃষ্টান্তের অনুসারী হইয়া, এইরূপে মহৎ পদ লাভ ও তদ্দ্বারা জীবনের সার্থক্য সাধন করিতে পারিবে। ফলতঃ, মহাত্মাদের জীবনচরিত পাঠ করিলে, বিবিধ শিক্ষা লাভ ও তৎপ্রভাবে মহোপকার-বৈচিত্র্য প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

মহাভাগ অগস্ত্য সবিশেষ-শ্রদ্ধাসহকৃত আগ্রহাতিশয় প্রদর্শনপূর্ব্বক এইপ্রকার জিজ্ঞাসা করিলে, মনস্বিনী উলূপী পরম অনুগৃহীত বোধ করিয়া, যেরূপ নিরতি প্রীতি অনুভব করিলেন, সেইরূপ করুণাবিশেষের আবির্ভাববশতঃ অতিমাত্র দীর্ঘ নিশ্বাস বিসর্জ্জন করিলেন। সেই নিশ্বাসপবনের সংসর্গে তদীয় সুকুমার বদনপদ্ম ক্ষণকালের জন্য শুষ্ক ও ম্লান হইয়া উঠিল এবং চক্ষুর তাদৃশ নির্ম্মল জ্যোতিরও যেন অধিক গ্লানি উপস্থিত হইল। তদবস্থায় তিনি ক্ষণমাত্র মৌনী হইয়া রহিলেন। বোধ হইল, যেন অসাধারণ জ্ঞানবলে সেই সহসা আপতিত মনোবেগ সংবরণে প্রবৃত্ত হইলেন।

তদ্দর্শনে মহাভাগ অগস্ত্য বিস্মিত ও অপ্রতিভের ন্যায় হইয়া কহিলেন, কল্যাণি! তুমি যে পথে প্রবৃত্ত ও যে স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছ, তাহাতে নিরবচ্ছিন্ন স্বর্গীয় সুখ-সম্পদ ও অখণ্ড আনন্দ ভিন্ন নরলোকসুলভ শোকতাপের লেশমাত্রও সম্ভাবিত নহে। ফলতঃ, অগ্নির শৈত্য যেমন স্বপ্নকল্পনা, এই কৈলাসে কোনরূপ শোকতাপও তদ্বৎ কল্পনামাত্র। অতএব তোমার শোকের কোনরূপ গুরুতর

কারণ থাকিবার সম্ভাবনা। যদি কষ্টকর হয়, তাহা হইলে, আর বলিবার আবশ্যকতা নাই। কেননা, কাহারও মনে কোন রূপে আঘাত করা কোন ক্রমেই উচিত নহে। এ বিষয়ে ঋষি মনুষ্য প্রভেদ নাই। অধুনা ইহাই আমার অতিমাত্র দুঃখ ও অতিমাত্র অনুতাপের কারণ হইয়াছে, যে, আমি না জানিয়া, তোমার নির্ব্বাণপ্রায় শোকানল প্রজ্বলিত করিলাম। হায়, তাহার জীবন কি পবিত্র, যাহাকে কোন রূপে অনুতাপ করিতে না হয়!

মহর্ষি অগস্ত্য এবংবিধ-বচন-রচনা-পুরঃসর পূর্ব্ববৎ অপ্রতিভের ন্যায়, মৌনাবলম্বন করিয়া, আসীন হইলে, মনস্বিনী উলূপীও অপ্রতিভের ন্যায়, তৎক্ষণে আত্মসংযম করিয়া, সসম্ভ্রমে ও সবিনয়ে কহিলেন, ব্রহ্মন্! অনুতাপই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। আমি পূর্ব্বে যে পাপ করিয়াছি, তাহা এতদূর ভয়ঙ্কর, যে, স্মরণ হইলেই, আমার এইপ্রকার মুমূর্ষু দশার শেষদশার সঞ্চার হয়। কতদিন হইল, আমি এই পবিত্র পথে প্রবৃত্ত হইয়া, ঈদৃশ অতিপবিত্র প্রদেশের আশয় লইয়াছি। তথাপি, ঐপ্রকার যাতনায় হস্ত অতিক্রম করিতে পারিলাম না। আমার মনে হয়, ইহ জীবনেও পারিব, কি না সন্দেহ। সে দিবস ভগবতী পর্ব্বততনয়া আপনার ভক্তসমাজে পাপের ভয়াবহতা ও পরিণাম-শোকাবহতার উপদেশ করিতেছিলেন; সবিশেষ শ্রবণ করিয়া, আমার এইপ্রকার অবস্থার আবির্ভাব হইয়াছিল। ফলতঃ, পাপের কোনরূপ প্রসঙ্গমাত্র দর্শন বা শ্রবণ করিলেই, আমি ঈদৃশ বিসদৃশ অবস্থাযোগ ভোগ করিয়া থাকি এবং তৎকালে এই বলিয়া করুণ

হৃদয়ে সকলের বিধাতা ভগবান্‌কে স্মরণ করিয়া, প্রার্থনা করি, ভগবন্ সত্যপুরুষ! কেহ যেন কখন পাপ না করে! পাপীর মর্ম্মস্থল এক বারেই এরূপ জর্জরিত হইয়া যায়, যে, উহা আর কোন রূপেই পূর্ব্ববদ্‌ভাব প্রাপ্ত হয় না। শাস্ত্র-কারেরা কহিয়াছেন, পাপী অর্দ্ধক প্রাণশূন্য এবং তাহার আত্মাও জর্জ্জরিত ও সর্ব্বথা অপ্রদীপ্ত। উহাতে সুনির্ম্মল পরমাত্মজ্যোতিঃ প্রস্ফুরিত হয় না। এই জ্যোতির প্রস্ফু-রণরূপ আলোকযোগেই পূর্ণানন্দরূপ চরম নির্বৃতিসুখ লক্ষিত হইয়া থাকে। আমি যখন যখন ইহা মনে করি, তখন তখনই অন্তরে অন্তরে চকিত ও আহত হইয়া থাকি। হায়, আমি পাপ করিয়াছি বলিয়া, ঈদৃশ পবিত্র স্থানেও তজ্জ-নিত অনুতাপদহনের পরিহারলাভে সমর্থ হইতেছি না! ভগবতীর প্রসাদে আমার দিব্যজ্ঞান সঞ্চরিত ও তন্নিবন্ধন জীবন্মুক্তি সংঘটিত হইয়াছে। কিন্তু আজিও পূর্ব্বস্মৃতির বিলয়রূপ পরমসুখ-যোগসৌভাগ্য সংগ্রহ করিতে পারিলাম না। দেবী বলিয়াছেন, এই কলেবরপরিহার হইলেই, ঐ স্মৃতিরও পরিহার হইবে। ভগবন্! এক্ষণে সেই শুভ-দিনের প্রতীক্ষা করিয়া, কথঞ্চিৎ সুখদুঃখে এই সুখদুঃখময় প্রাণ ধারণ করিয়া আছি। বলিতে কি, আমি যে তাদৃশ-পাপিনী হইয়াও, দেবীর পরিচারিণী হইতে পারিয়াছি, ইহাই আমার পরমসৌভাগ্য, সন্দেহ কি? হায়, লোকের যেন জন্মজন্ম এইপ্রকার সৌভাগ্যসংঘটিত হয়! ফলতঃ, পাপের ফল যেমন সাক্ষাৎ ভয় ও শোক, পুণ্যের পরিণাম তদ্রূপ অভয় ও অমৃত।

অধুনা, স্বকীয় অতিসামান্য জন্মবৃত্তান্ত বর্ণন করিতেছি, শ্রবণ করুন। এই কৈলাসপর্ব্বতের বহুযোজনব্যবধানে কোন গহন অরণ্যানী মধ্যে ভূতমণ্ডলনামে এক ক্ষুদ্র পল্লী আছে। যাহার যেপ্রকার সহবাস, তাহার তদ্রূপ রীতিচরিত্র সংঘটিত হইয়া থাকে। চতুর্দ্দিকে সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্র পশু ও ভয়ানক কণ্টকী গহন; তাহার মধ্যে দুই এক গৃহে দুই একটীমাত্র অধিবাসী; তাহাদের আবার কোনপ্রকার শিক্ষা নাই ও দীক্ষা নাই। এই রূপে ঐ ক্ষুদ্র গ্রামের প্রতিষ্ঠা। সুতরাং, অধিবাসিগণ যে সিংহব্যাঘ্রাদির অনুরূপ প্রকৃতি বিশিষ্ট হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? প্রকৃত পক্ষে তাহাই ঘটিয়াছিল। অধিবাসিরা আজন্ম ধনুর্ব্বাণ ধারণ, বনে বনে বিচরণ, বিবিধ পশু মারণ ও দুইএকটী সামান্য শিল্পমাত্রের সংঘটন ভিন্ন সংসারের আর কিছুই জানিত না, বা, মানিত না। ক্ষুধা হইলে, যাহা তাহা যে সে রূপে ভক্ষণ; নিদ্রা হইলে, যত্র তত্র যে সে রূপে শয়ন; কোন বিষয়ে কোনরূপ বিচার নাই ও মীমাংসা নাই; আগামী কল্য কি হইবে, তাহার কোনপ্রকার ভাবনা নাই; এবং শীতবাত রৌদ্রবৃষ্টিতে পশুর ন্যায় অনাবৃত বিচরণ, এইরূপ জঘন্য ও নগণ্য বিধানে কিয়ৎ দিনের জন্য কোন রূপে জীবনধারণই তাহাদের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল তাহাদের মধ্যে লেখনপঠনের কোনরূপ চর্চ্চা ছিল না; লোকযাত্রা বা সংসারযাত্রা নির্ব্বাহের কোনরূপ ব্যবস্থা বা শৃঙ্খলা ছিল না এবং ভবিষ্যৎ বা বর্ত্তমান কোন কালেরই জন্য কোনরূপ সাধন ছিল না। এইজন্য তাহাদের দুঃখের অবধি ছিল

না। হয় ত তাহাদের কোন দিন অনশনে, কোন দিন অর্দ্ধাশনে, কোন দিন বা দগ্ধাশনে অতিবাহিত হইত। কাহারও নিয়মিত বাসগৃহ ছিল না। কেহ কোটরে, কেহ গহ্বরে, কেহ গুহাদিতে ও কেহ বা বৃক্ষতলে ইচ্ছানুসারে বাস করিত। ক্বচিৎ কোন স্থলে দুই এক খানি অতিক্ষুদ্র পর্ণকুটীর, পক্ষীর কুলায়ের ন্যায়, লক্ষিত হইত। কিন্তু তৎসমস্ত এরূপ দুস্থ ও অপ্রকৃতিস্থ এবং তন্নিবন্ধন বাসের এরূপ অনুপযুক্ত, যে, থাকা অপেক্ষা না থাকাই ভাল ছিল। তাঁহাদের হৃদয় বা মন ছিল, কি না, বলিতে পারা যায় না। কেননা, আত্মার উৎকর্ষবিধানই হৃদয়বত্তা বা মনস্বিতার লক্ষণ। পণ্ডিতেরা যেখানে আত্মার উৎকর্ষ অবলোকন করেন, সেই খানেই মন ও হৃদয়ের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। এই আমি অদ্য দারুণ দুঃখ কোন রূপে ভোগ করিলাম; আমার যদি হৃদয় ও মন থাকে, আগামী কল্য তাহা স্মরণ করিয়া, অবশ্যই সাবধান হইব, যাহাতে পুনরায় ঐরূপ দুঃখে পতিত না হইতে হয়। এই ক্ষুদ্রবুদ্ধি হরিণ সে দিবস ব্যাঘ্রকবলে পতিত ও মৎকর্তৃক উদ্ধৃত হইয়াছিল। কিন্তু ইহার হৃদয় না থাকাতে, পুনরায় সেই সংকটস্থানে গমন করিয়াছিল। আমি জানিতে পারিয়া, তৎক্ষণে ইহাকে প্রত্যাবৃত্ত ও স্বকীয় আশ্রমে আনয়নপূর্ব্বক সাবধানে সুরক্ষিত করিয়াছি। তদবধি আর ইহাকে একাকী পরিহার করি না। কেননা ইহার হৃদয় নাই, তজ্জন্য পুনরায় তাদৃশ সংশয়দশায় পতিত হইতে পারে।

অগস্ত্য কহিলেন, কল্যাণি! বলিয়া যাও, বুঝিতে

পারিয়াছি, লোকের দুঃখ তোমাকে অতিমাত্র ব্যাকুল করিয়া থাকে। বাস্তবিক, পরের দুঃখে ব্যাকুল হওয়াই সাধুতা বা প্রকৃত মনুষ্যত্ব। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, প্রস্তরাদি কঠিন পদার্থ সকলই কোন কালে কোন রূপে আর্দ্র হয় না। হৃদয়ও যদি সেই রূপে আর্দ্র না হয়, তাহা হইলে, পাষাণের সহিত তাহার আর পার্থক্য কি? তোমার সাধু ও সরল হৃদয়ে যে আঘাত লাগিয়াছে, তাহা স্বভাবসিদ্ধ। আঘাত না লাগাই অস্বাভাবিক, সন্দেহ কি? অধুনা, মনোবেগ সংবরণ করিয়া, প্রকৃত ঘটনা বলিয়া যাও; শুনিবার জন্য সাতিশয় ঔৎসুক্য হইতেছে।

উলূপী কহিলেন, অনুগ্রহপূর্ব্বক অবধান করুন। হতভাগিনী আমি উল্লিখিত ভূতমণ্ডলবাসী ব্যক্তিগণের মধ্যে রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, বলে, বিক্রমে, সর্ব্বাংশেই গণ্য মান্য প্রাতঃস্মরণীয়নামধেয়সম্পন্ন, পরমধর্ম্মিষ্ঠ কোন শবরের বৃদ্ধ বয়সে অতিক্লেশে পরমপাপীয়সী কন্যা রূপে অবতরণ করিয়া জননী আমাকে প্রসব করিয়াই, দুশ্চিকিৎস্য সান্নিপাতিক বিকারে তৎক্ষণে প্রাণত্যাগ করেন। তাদৃশ বৃদ্ধবয়সে পরমপ্রিয়তমা পত্নীর বিয়োগ সংঘটিত হওয়াতে, পিতৃদেব যদিও অতিমাত্র বিহ্বল ও ব্যাকুলভাবাপন্ন হইলেন, কিন্তু একমাত্র কন্যা ভাবিয়া, অতিমাত্র যত্ন ও আদর সহকারে আমার লালন পালন করিতে লাগিলেন। বলিতে কি, আমাকে প্রাপ্ত হইয়া, তিনি অনেকাংশে পত্নীশোক বিস্মৃত হইলেন। আমার প্রতি তাঁহার স্নেহের ও মমতার সীমা ছিল না। আমি শতশঃ অপরাধ করিলেও, তিনি

আমাকে কোনরূপ শাসন করা দূরে থাকুক, তদ্বিষয়ে ভ্রূক্ষেপই করিতেন না। আমি তাঁহার এইপ্রকার প্রশ্রয়-দোষে ক্রমে ক্রমে এরূপ দুর্ললিত হইয়া উঠিলাম যে,কোনরূপ শাসনে থাকা আমার পক্ষে নিতান্ত অসাধ্য ও ক্লেশকর হইল। পল্লীবাসী ব্যক্তিমাত্রেই আমার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিল। শক্রমিত্র কেহই আমার প্রশংসা করিত না।

এইরূপ সুখদুঃখে বাল্যকাল অতীত হইলে, গ্রীষ্মের পর বসন্তের ন্যায়, আমার শরীরে নবযৌবনের আবির্ভাব হইল। বসন্তের উদয়ে মাধবীলতায় যেরূপ পুষ্প সমুৎপন্ন হয়, যৌবনের আবির্ভাবে আমার দেহে তদ্রূপ অপূর্ব্ব শ্রীপদ গ্রহণ করিল। মধুকরী যেমন উন্মাদিনী হইয়া, পুষ্প হইতে পুষ্পান্তরে বিচরণ করে, আমিও তদ্রূপ যৌবনমদে মত্তা হইয়া, যেখানে সেখানে যদৃচ্ছা বিচরণ করিতে লাগিলাম। এই রূপে বয়স্কাল উপস্থিত হইলে, পিতা আমাকে উপযুক্ত পাত্রে সম্প্রদান করিয়া, যেন নিশ্চিন্ত হইয়া, ইহলোক পরিবীত করিলেন। সংসারে স্বামী ভিন্ন আমাকে আমার বলিতে আর কেহই রহিল না। স্বামীও আমাকে তাদৃশ স্নেহ, মমতা বা যত্ন শ্রদ্ধা করিতেন না। আমার অতিমাত্র ব্যাপকতা, অতিমাত্র প্রগল্‌ভতা ও অতিমাত্র যথেচ্ছকারিতাই এবিষয়ের একমাত্র হেতু। পরগৃহে পরিচরণ, পরপুরুষপরিদর্শন, উচ্চৈস্বরে গুরুজনসান্নিধ্যে হাস্য ও সম্ভাষণ, স্বামীর অনভিমতে প্রবর্ত্তন, গৃহকার্য্যের অযথাকরণ, ইত্যাদি যে সকল বিষয় স্ত্রীলোকের পক্ষে একান্ত দোষাবহ ও ঘৃণাজনক, আমি সর্ব্বদাই তাহার অনুষ্ঠান করিতাম। বিশে-

যতঃ, অনুক্ষণ দ্বারদেশে দণ্ডায়মান হইয়া, পথিকদিগকে দর্শন ও সম্ভাষণ করা আমার স্বভাব ছিল। এই কারণে শ্বশুরকুলের সকলেই আমার প্রতি বিরক্ত হইয়া উঠিলেন।

ঐ সময়ে প্রতিবেশবাসী কোন ব্রাহ্মণকুমার অকারণ-বৈরপরতন্ত্র হইয়া, আমার স্বামীকে একদা কহিলেন, তোমার স্ত্রী ব্যভিচারিণী হইয়াছে। কিন্তু ভগবন্! আমি ঐ সচরাচর জগতের সাক্ষী চন্দ্র সূর্য্য উভয়কে প্রমাণ করিয়া বলিতেছি, ব্যভিচার কাহাকে বলে, তাহার নামমাত্র অবগত নহি। ঈশ্বর করুন, কখনও যেন কাহাকেও তাহা জানিতে না হয়। কিন্তু আমার সরলহৃদয় মুগ্ধস্বভাব স্বামী তাহা বুঝিলেন না। ব্রাহ্মণের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি। সুতরাং, তিনি পূর্ব্বাপর পর্য্যালোচনা পরিশূন্য হইয়াই, আমাকে দেশপ্রথা অনুসারে সারমেয় মুখে নিক্ষেপ করিতে উদ্যত হইলেন। আমার শ্বশ্রূদেবী আমাকে সর্ব্বথা নিরপরাধিনী জানিতেন। কিন্তু পুত্রের প্রতি প্রগাঢ় প্রীতিপ্রযুক্ত কোন রূপ প্রতিকার করিতে তাঁহার প্রবৃত্তি হইল না। তিনি কেবল অনুগ্রহ করিয়া, এইমাত্র কহিলেন, তুমি ইচ্ছা করিলে, আমার সাহায্যে ও কৌশলে পলায়ন করিতে পার। আমি সর্ব্বথা নিরুপায় ভাবিয়া, ব্যাকুল বচনে কহিলাম, জননি! আমি কুলবতী, একাকিনী কোথায় পলায়ন ও কিরূপেই বা আত্মরক্ষা করিব? তিনি কহিলেন, তোমার ত আর কুলবতী নাম নাই; তুমি ব্যভিচারিণী হইয়াছ। ব্যভিচারিণীর আবার

আত্মরক্ষা কি ? তাহার এই মুহূর্ত্তে মরণই মঙ্গল। আমি এই কথায় বজ্রাহতবৎ অতিমাত্র ব্যথিত ও মর্ম্মে মর্ম্মে নিরতিশয় আহত হইয়া, সমস্ত সংসার শূন্য ভাবিয়া, সাশ্রুলোচনে তৎক্ষণে মস্তক অবনত করিলাম। বিকারবিশেষের আবির্ভাব হওয়াতে, সমস্ত শরীর কম্পমান ও মস্তক ঘূর্ণায়মান হইয়া উঠিল। সুখের অবস্থা কি দুঃখের দশা, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনন্তর বাতাহত কদলীর ন্যায়, একান্ত অসহমান হইয়া ভূমিতলে পতমান হইলে, পরমপূজনীয়া শ্রীশ্রীমতী শ্বশ্রূদেবী করুণারসবশংবদ হইয়া, আমাকে ক্ষণবিলম্বব্যতিরেকেই প্রসারিত ভুজযুগলে ধারণ করিলেন এবং বৎসে! আশ্বস্ত হও, আশ্বস্ত হও, এইপ্রকার সুমধুর বাগ্বিন্যাস পুরঃসর বলিতে লাগিলেন, সুভগে! আমি তোমার হৃদয় পরীক্ষা করিতেছিলাম। তুমি বাস্তবিক সতী পতিব্রতা। আমার সৌভাগ্য যে, তোমার সদৃশী সাধ্বী রমণী আমার গৃহে পদার্পণ করিয়াছেন। কিন্তু দুষ্টবিধাতা, না জানি, কি অপরাধে আমাকে আর সেই অসুলভ সৌভাগ্যযোগ ভোগ করিতে দিলেন না। যাহা হউক, আমার বিলক্ষণ ধারণা আছে যে,ধর্ম্মকে রক্ষা করিলে, তিনি রক্ষা করেন। তুমি চিরকাল পাতিব্রত্যরূপ পরমধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছ। সেই পুণ্যবলে সর্ব্বথা রক্ষিত হইবে। বলিতে কি, রণে বনে, শত্রুজলাগ্নি মধ্যে যেখানেই থাক, ধর্ম্মই তোমাকে রক্ষা করিবেন।

বলিতে বলিতে আপতিত মনোবেগের আতিশয্যবশতঃ তাঁহার শোকানল উদ্বেল হইয়া উঠিল। অনর্গলবিগলিত

অশ্রুসলিলে তাঁহার লোচনযুগল পরিপূর্ণ এবং অতিদুর্ভর বাষ্পভরের উত্তরোত্তর আবির্ভাবপ্রযুক্ত সহসা কণ্ঠরোধ হও-য়াতে, অর্দ্ধপথেই তাঁহার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া গেল। ঐ সময়ে অবসাদবিশেষের আতিশয্যবশতঃ তিনি জড়ের ন্যায়, চিত্রিতের ন্যায় যেন জীবনী শক্তিবিরহিত হইয়া, সহসা বসিয়া পড়িলেন। আর উত্থান করিতে পারিলেন না। তদ্দর্শনে আমি উচ্ছলিত শোকাবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, প্রকৃত জননী ভাবিয়া অকৃত্রি স্নেহলালিত কন্যার ন্যায়, দৃঢ়করে তদীয় গলদেশ ধারণ করিয়া, অবিরলজল-ধারাকুল লোচনে তারস্বরে অনবরত ক্রন্দন করিতে লাগি-লাম। হৃদয় যেন শূন্য হইয়াছিল; মন যেন শরীর ত্যাগ করিয়াছিল; প্রাণ যেন আর দেহে ছিল না; আত্মাও যেন অন্তর্হিত হইয়াছিল; বুদ্ধি ও চেতনারও যেন লেশ ছিল না; কি করি, কোথা যাই, উপায় কি, অবলম্বন কি? কিছুই স্থিরতা নাই; এইপ্রকার অবস্থায় মত্তের ন্যায়, প্রমত্তের ন্যায়, কেবল ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। আমার ক্রন্দনে দিগ্‌বিদিক পূর্ণ ও আকাশপাতাল প্রতিধ্বনিত হইলে, প্রতিবেশবাসী ব্যক্তিমাত্রেই স্তম্ভিত হইয়া উঠিল। ব্যভিচারিণী ও কলঙ্কিনী বলিয়া, পল্লীতে পল্লীতে আমার অকারণ দুর্নাম সংঘটিত হইয়াছিল। যাহারা সত্যঘটনা অবগত ছিল, তাহারাও লোকলজ্জাভয়ে আমার সহিত সম্ভাষণ করিত না। সুতরাং আমার ক্রন্দনে কাহারই অনুবৃত্তি হইল না; যাহাদের হইল, তাহারাও তাহা বল-পূর্ব্বক সংযত ও স্তম্ভিত করিয়া রাখিল। আমি একাকিনী

তদবস্থায় কুররীর ন্যায়, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিতে লাগিলাম। মনে আর কিছুই রহিল না।

ঐ সময়ে মোহময়ী মূর্চ্ছা বলবতী হইয়া, অন্ধকারময়ী মায়ার ন্যায়, সহসা আচ্ছন্ন ও অবসন্ন করিলে,আমি চৈতন্যশূন্য ভগ্নদেহে তৎক্ষণে ধরাতল আশ্রয় করিলাম। তদবস্থায় কিয়ৎক্ষণ অতিবাহিত হইলে, ক্রমে ক্রমে আমার সংজ্ঞা লাভ হইল। তখন হতভাগিনী আমি, পাপকারিণী আমি, দুরাচারিণী আমি, আত্মনাশিনী আমি শনৈঃ শনৈঃ নয়ন উন্মীলন করিয়া, অতিকষ্টে পার্শ্বপরিবর্ত্তনপূর্ব্বক অবলোকন করিলাম, আমার পরমারাধ্যা শ্বশ্রূদেবী রক্তাক্ত কলেবরে ধরাতলে লুণ্ঠিতা হইতেছেন। তাঁহার জিহ্বা ঈষৎ বহির্গত, নয়নযুগল তিরোহিত ও হস্তপদ লম্বিত হইয়া পড়িয়াছে। আর তাঁহার বদনমণ্ডলে সে জ্যোতিঃ নাই, প্রতিভা নাই, প্রকাশ নাই ও স্ফূর্ত্তি নাই। উহা যেন শিশিরকালীন পদ্মের ন্যায়, ম্লান হইয়াছে; প্রভাতকালীন চন্দ্রের ন্যায় নিষ্প্রভ হইয়াছে; নির্ব্বাণকালীন প্রদীপের স্তিমিত হইয়াছে এবং দৌরাত্ম্যকালীন লক্ষ্মীর ন্যায় মলিন হইয়াছে। এই কারণে আমি উহা রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায়, আর দেখিতে পারিলাম না। ভয়ে, শোকে, বিষাদে, মোহে, ব্যামোহে ও অতিমোহে অভিভূতা হইয়া, তৎক্ষণাৎ পাপনয়ন নিমীলন করিলাম। তৎকালের জন্য কথঞ্চিৎ স্বস্তিলাভ হইল। কিন্তু তদবস্থায় অধিক ক্ষণ থাকিতে পারিলাম না। তাঁহাকে প্রাণের সহিত, মনের সহিত ও অন্তরের সহিত অকপটস্নেহে, প্রীতি ও ভক্তি করিতাম।

হতভাগিনী আমি জাতমাত্রেই মাতৃক্রোড়ভ্রষ্ট হইয়াছিলাম। জননীর স্নেহমমতা কিরূপ উপাদেয়,তাহা শ্রুতি ভিন্ন কখনও অনুভবগোচর ও তন্নিবন্ধন প্রাণ মন আপ্যায়িত হয় নাই। হায় কি দুর্ভাগ্য! প্রাতঃস্মরণীয়া পুণ্যবতী জননী পরমপাপকারিণী আমাকে প্রসব করিয়াই. পরলোকে গমন করিয়াছিলেন! এই কারণে আমি সর্ব্বদাই শোকে,দুঃখে, ভারময় হত দগ্ধ জীবন কথঞ্চিৎ অতিবাহিত করিতাম। এতদিন যে বাঁচিয়াছিলাম, শ্বশ্রূদেবীর মাতৃনির্ব্বিশেষ স্নেহ-মমতাই তাহার একমাত্র হেতু। বাস্তবিক, তাঁহার যত্নাতিশয়সহকৃত স্নেহাতিশয় প্রাপ্ত হইয়া, আমার মাতৃশোক অনেকাংশে পরিহৃত ও স্মৃতিপবীর বহির্ভূত হইয়াছিল। তাঁহাকে তদবস্থ দর্শন করিয়া, সেই শোক নবীভূত ও দ্বিগুণিত হইয়া উঠিল। আর আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। শতবৃশ্চিকদষ্টার ন্যায়, শতকষাহতার ন্যায়, তৎক্ষণে গাত্রোত্থান করিয়া, আলুলায়িত কেশে উন্মাদিনীবেশে তাহার কলেবর দৃঢ়করে ধারণ করিলাম। সহসা আমার বামহস্ত দৃঢ়তর প্রতিহত হইয়া উঠিল। তখন ব্যাধবিদ্ধা মৃগীর ন্যায়, সারমেয়পরিতাড়িতা ক্ষুদ্র জম্বুকীর ন্যায়, অতিচকিত ভীত দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া দেখিলাম, তাঁহার-বামকক্ষের নিম্নদেশে খরধার কর্ত্তরী মুষ্টি পর্য্যন্ত মগ্ন হইয়া রহিয়াছে। তাহারই দুরন্ত আঘাতে তদীয় কোমল, কৃপণ, নিরীহ জীব মহাপ্রস্থান করিয়াছে।

এবংবিধ অতি জুগুপ্সিত হত্যাকাণ্ড দর্শন করিয়া, আমি ভয়ে ও মোহে অভিভূত হইয়া, কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়ার ন্যায়,

তূষ্ণীম্ভাবে উপবেশন করিয়া রহিলাম। ভাবিলাম, আমি যেরূপ হতভাগিনী ও নিরয়শালিনী, তাহাতে, পল্লীবাসী ব্যক্তিমাত্রেই অনায়াসে মনে করিতে পারে, যে, আমিই এই অতি বিগর্হিত হত্যাব্যাপার স্বহস্তে সমাহিত করিয়াছি। অতএব অধুনা কর্ত্তব্য কি? নিতান্ত ম্রিয়মাণা ও দোলায়মানা হইয়া, এইপ্রকার ব্যাকুল ব্যাকুলচিন্তা করিতেছি,এমন সময়ে সহসা আমার পৃষ্ঠদেশে গুরুতর পদাঘাত হইল। দুরন্ত প্রহারব্যথায় সর্ব্বশরীর কম্পিত, শিথিলিত ও যেন জর্জ্জরিত হইয়া উঠিল। কথঞ্চিৎ আত্মসংবরণ করিয়া, পশ্চাৎভাগে চকিতদৃষ্টি নিক্ষেপপূর্ব্বক অবলোকন করিলাম,আমার স্বামী কম্পমান কলেবরে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। তাঁহার দুই চক্ষু লোহিতায়মান ও ঘূর্ণায়মান; বদনমণ্ডল অতিমাত্র ঘোরায়মান ও অন্ধকারায়মান এবং অধরোষ্ঠ ধূমায়মান ও তিরোধীয়মান। তিনি যেন মূর্ত্তিমতী মত্ততা ও বিগ্রহবান্ ক্রোধ অথবা তাহা অপেক্ষাও ভয়ঙ্কর শোচনীয় বেশে আমার সকাশে তদবস্থ দণ্ডায়মান হইয়া, অবিরাম গতিতে নিশ্বাসভার পরিহার করিতেছেন। তাঁহার কলেবর কৃশ, বিবর্ণ, মলিন, ঘর্ম্মসলিলে পরিপূর্ণ ও উৎকট দুর্গন্ধবিশিষ্ট। মুখমণ্ডলে কোনরূপ প্রতিভাবা হৃদয়ের ছায়া নাই। লোচনযুগলে কোনপ্রকার সত্তাস্ফূর্ত্তির লেশ নাই, তেজস্বিতা নাই, বিকাস বা ব্যক্তভাব নাই। এবং আকার প্রকারেও কোনরূপ জীববত্তার চিহ্ন বা আত্মপ্রতীতির অণুমাত্র উদয় নাই। দেখিলে, মনুষ্য বলিয়াই, বোধ হয় না। সর্ব্বদাই উন্মনা, অন্যমনা ও বিমনা। শত

আহ্বানেও উত্তর নাই; শত গর্জ্জনেও ভ্রূক্ষেপ নাই; শত পুরস্কারেও প্রতিগ্রহ নাই এবং শত তিরস্কারেও পরিহার নাই। হতভাগিনী আমার ব্যভিচার ঘটনা শ্রবণ করিয়া অবধি তাঁহার এইপ্রকার উন্মাদ লক্ষণ আবিষ্কৃত হইয়াছিল। আমি ভয়ে তাঁহার ত্রিসীমায় যাইতে পারিতাম না। কদাচিৎ ক্বচিৎ সাক্ষাৎ হইলে,তৎক্ষণাৎ যমসম ভাবিয়া, নয়নযুগল মুকুলিত করিয়া,তথা হইতে অন্যত্র গমন করিতাম। আজি আর সেরূপ ঘটিল না। প্রদীপ নির্ব্বাণের পূর্ব্বে উজ্জ্বল হয়। আমারও তাহাই হইল। চিরকাল স্বামীর সহিত দুরন্ত বিয়োগরূপ নিদারুণ নির্ব্বাণদশা সংঘটিত হইবে বলিয়া, আজি আমি তাঁহার সমাগমলাভরূপ পরম উজ্জ্বল অবস্থাযোগ ভোগ করিলাম। আর তাঁহাকে সেরূপ কৃতান্তোপম বোধ হইল না। বোধ হইল যেন, অভীষ্ট দেবতা তাদৃশ ছদ্মবেশে সাক্ষাৎকারে আবির্ভূত হইয়াছেন। সমুদায় শঙ্কা ও সমুদায় ভয় দূর হইল। সমুদায় মোহ ও সমুদায় অবসাদ তিরোহিত হইল। হৃদয় আহ্লাদে, আনন্দে, উৎসাহে ও সাহসে পূর্ণ হইল। শতদিকে শত আশার দ্বার বিস্তৃত হইল। যিনি কথা কহিতেন না; তিনি আজি পদ দ্বারা স্পর্শ করিয়া, পরম পবিত্র করিলেন। স্বামীর পাদস্পর্শই স্ত্রীলোকের সাক্ষাৎ সৌভাগ্য ও মূর্ত্তিমান্ স্বর্গসম্পদ্। সুতরাং, তাঁহার পদাঘাতেও পরম সৌভাগ্য বোধ করিলাম।

এস্থলে,এ কথা বলা বাহুল্য যে,মিথ্যা ব্যভিচার ঘটনার প্রচার অবধি আমার স্বভাবের সম্পূর্ণ পরিবর্ত্ত হইয়াছিল।

আমি আর সে প্রকার ব্যাপিকা, প্রগল্‌ভা, অবিধেয়া, বেশ্যা-বদ্ভাবা ও পৌরুষগর্ভা ছিলাম না। সর্ব্বদাই অবরোধ মধ্যে অবস্থিতি করিতাম; শ্বশ্রূ শ্বশুরের কায়মনে সেবা করিতাম; একচিত্তে গৃহকার্য্য সম্পাদন করিতাম; স্বামী কি উপায়ে প্রসন্ন হন, তাহারই চেষ্টা করিতাম। ফলতঃ, স্ত্রীজাতির গৃহে কর্ত্তব্য, তাহাই করিতাম। এই রূপে স্বভাবের পরিবর্ত্ত হওয়াতেই, আজি আমার স্বামীর তাদৃশ পদাঘাতও বহুসৌভাগ্য বোধ হইল। আমি আস্তেব্যস্তে গাত্রোত্থান করিয়া, নাথ! প্রসন্ন হউন, বলিয়া, দৃঢ়করে তাহার পদদ্বয় জড়িত করিয়া, ধারণ করিলাম। এবং অনর্গল অশ্রুজল বর্ষণপূর্ব্বক তাহা প্লাবিত করিয়া তুলিলাম। তিনি একবার প্রসন্ন ও আরবার বিরক্ত হইলেন। মনুষ্যের মন অতিমাত্র ক্ষীণ। এই কারণে উহা অল্পেই আহত ও ভগ্ন হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, যে অন্তঃকরণে কোনরূপ শিক্ষার সম্পর্ক নাই, তাহার অবস্থা আরও শোচনীয় ও ভয়ঙ্কর। উহা অন্ধকারময় গভীরগর্ত্তের সহিত উপমিত হইয়া থাকে। ঐরূপ গর্ত্তমধ্যে যেমন আলোক প্রবেশ করিতে পারে না, শিক্ষাহীন তাদৃশ অন্তঃকরণেও তদ্রূপ জ্ঞানের প্রবেশ হয় না। জ্ঞানহীন ব্যক্তি শোকে যেমন বিহ্বল হয়, সুখেও তদ্রূপ মত্ত হইয়া থাকে! অধিক কি, যেখানে জ্ঞান নাই, শিক্ষা নাই, সেখানে কোন প্রকার ব্যবস্থা নাই এবং যেখানে ব্যবস্থা নাই, সেখানে রোষ-তোষেরও কোন প্রকার স্থিরতা নাই। ভগবন্! আমি গুরুনিন্দা করিতেছি না, সত্য ঘটনাই বলিতেছি। আমার

স্বামীরও অবিকল তদনুরূপ অবস্থা ছিল। তিনি স্বভাবতঃ নিরক্ষর ও নির্ব্বর্ণ শবর জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহাতে আবার অষ্টপ্রহর কুক্কুরগণের সহিত বনে বনে বিচরণপূর্ব্বক মৃগবরাহাদি পশুযূথ হনন করিয়া, তাহার মন আরও বিকৃত হইয়াছিল। কোনদিকে কোনরূপ সৎ-শিক্ষার নামমাত্র ছিল না। ক্রুদ্ধ বা উত্তেজিত হইলে, সিংহ ব্যাঘ্রের, ন্যায়, ভয়ংকর বিগ্রহ পরিগ্রহ করাই ঐরূপ শিক্ষাহীন, বর্ণহীন লোকের একমাত্র স্বভাব। অথবা, আর পাপকথার বহুলবর্ণণায় আবশ্যক নাই। সংক্ষেপে—অতি সংক্ষেপে শেষ ঘটনা বলিতেছি, শ্রবণ করুন।

অগস্ত্য কহিলেন, কল্যাণি! নিঃশঙ্কে বলিয়া যাও; তোমার ন্যায় বুদ্ধিমতী রমণীর কোন কথায় কোনরূপে প্রতিবাদ বা প্রতিঘাত করিতে আমার অভিলাষ নাই। তথাপি, লোকশিক্ষা ও আত্মসংশয় ছেদনানুরোধে বলিতেছি, তোমার ন্যায় অতীব কোমলপ্রাণা ও কোমলমনা রমণী তাদৃশ দুর্দ্দম্য পশুপ্রকৃতি স্তব্ধচিত্ত স্বামীর প্রতি কিরূপে প্রীতিবন্ধন করিয়াছিলেন? আমার ইহা একান্ত বিষম ও অসম্ভব বোধ হইতেছে। দেখ, প্রস্তর ও কর্দ্দম কখনও মিলিত হয় না।

উলূপী কহিলেন, ভগবন্! আপনি সত্য বলিয়াছেন, জল ও অনলে কখন মিলন হয় না। কিন্তু বিধাতা লতা ও স্ত্রী এই উভয়কে একবিধ অপূর্ব্ব উপাদানে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ দেখুন, ঐ অতি কোমল কালীলতা এই অতি কঠিন কণ্টকতরুকে গাঢ়তর আলিঙ্গন করিয়া, কেমন সুখসচ্ছন্দে

বর্দ্ধিত হইতেছে! ঐ দেখুন, ঐ লতার আপাদমস্তক সর্ব্ব-শরীর কেমন সুকুমার সুস্বাদ ফলকুসুমে অলঙ্কৃত হইয়াছে। স্ত্রীজাতিও এবংবিধা জানিবেন। পুরুষ সুবৃত্ত দুর্বৃত্ত যাহাই হউক, স্ত্রী কখন তাহাতে বীতরাগিণী নহে। এই কারণে পণ্ডিতেরা পুরুষ অপেক্ষা স্ত্রীর রজোগুণাধিক্য বর্ণন করিয়াছেন। পুনশ্চ, পুরুষ এই কারণেই স্ত্রীতে অতিমাত্র আসক্ত ও তন্নিবন্ধন অতিমাত্র বদ্ধ হইয়া থাকে। বলিতে কি, এই কারণেই স্ত্রীসেবা বিষবৎ বিষম ও ন্যক্কারবৎ অতীব জুগুপ্সিত বলিয়া, সর্ব্বথা পরিহার করিতে ভূয়োভূয়ঃ উপদেশ বিহিত হইয়াছে। আপনার ন্যায়, জ্ঞানবিজ্ঞানপারদর্শী মহামতি মহর্ষিকে এ বিষয়ে অধিক বলা বাচালতা মাত্র। অতএব আমি প্রস্তুত বিষয়ে প্রবৃত্ত হইলাম। অনুগ্রহ-পূর্ব্বক অবধান করুন।

আমি সেইরূপ পদদ্বয় ধারণ করিয়া, বীণার ন্যায়, মৃদু-স্বরে রোদন করিতে আরম্ভ করিলে, তিনি কিয়ৎক্ষণ উন্মনার ন্যায়, ঊর্দ্ধদৃষ্টিতে কি ভাবিতে লাগিলেন। অনন্তর বিরক্তসন্তোষসহকারে মৃদুস্বরে আমারে ধীরে ধীরে কহিলেন, বাস্তবিক তুমি যদি সতী হও, তাহা হইলে, পর-লোকে পুনরায় উভয়ের সমাগম হইবে। এই পাপলোকে উভয়ের আর কোন প্রত্যাশা নাই। অতএব তুমি অনন্য-চিত্তে সেই শুভদিনের অপেক্ষা কর; যে দিন উভয়ে বিধা-তার সুখময় রাজ্যে পরমসুখে পরস্পর সমাগত হইয়া, নির্ম্মল শান্তিসুখ ভোগ করিয়া, এই পাপতাপে হতদগ্ধ অসার জীবন সার্থক করিব। হায়, এই মনুষ্যলোকে হিংসা দ্বেষ সন্তাপ-

পূর্ণ পাপলোকে সেই নির্ম্মল শান্তি দিব্যসুখের সম্ভাবনা কোথায়! এখানে একমাত্র পাপেরই রাজত্ব, অধর্ম্মেরই একাধিপত্য, অন্যায়েরই একচ্ছত্রিত্ব, অত্যাচারেরই সর্ব্বে-সর্ব্বত্ব এবং অবিচারেরই পূর্ণবিভবত্ব? তাহার উপর আবার হিংসা আছে, দ্বেষ আছে, ঈর্ষ্যা আছে, অসূয়া আছে, অপবাদ ও বিবিধ বিবাদ আছে এবং এইরূপ ও অন্যরূপ আরও কত কি উপদ্রব ও উৎপাত আছে; যে সকলের প্রাদুর্ভাব-প্রযুক্ত ধর্ম্ম অন্তর্হিত হইয়াছে; শান্তি লুক্কায়িত হইয়াছে; পুণ্য পলায়িত হইয়াছে এবং ন্যায় বিদ্রুত ও বিদলিত হই-য়াছে। এই কারণে এই মর্ত্ত্যলোকে সুখের নাম নাই; সন্তোষের লেশ নাই; আহ্লাদের সম্পর্ক নাই; আনন্দের গন্ধ নাই এবং হর্ষেরও কথামাত্র নাই। যাহা আছে, তাহাও নামমাত্র ও কল্পনামাত্র। নিত্য সুখী নিত্য সন্তুষ্ট ও সর্ব্বথা নিশ্চিন্তচিত্ত এরূপ ব্যক্তি মনুষ্যলোকে স্বপ্নবৎ, কল্পনাবৎ, আকাশকুসুমবৎ হইয়াছে। জানিনা, লোকে কি ভাবিয়া ও কি বুঝিয়া, ঈদৃশ নরকবৎ, ন্যক্কারবৎ ও মূর্ত্তিমতী জুগুপ্সাবৎ অতি জঘন্য পাপ ভুবনে বাস করে! আমি ত ইহাতে সুখের, সন্তোষের ও পবিত্রতার কিছুই দেখিতে পাই না। আমার বয়স পূর্ণপঞ্চবিংশতি অতিবর্ত্তন করিয়াছে। তিনশত পঁয়ষষ্টি দিনে বৎসর গণনা করিলে, এই পঞ্চবিংশতি বৎসরে কত সহস্র দিন অতিবাহিত হই-য়াছে, ভাবিয়া দেখ। কিন্তু কি দুঃখের কথা! আমি ঐ সকল ভুবনসাক্ষী চন্দ্র সূর্য্যের দিব্য করিয়া ও দোহাই দিয়া, স্পষ্টাভিধানে বলিতেছি, ঈদৃশ অতি দীর্ঘকালের মধ্যে এক-

দিনের জন্যও প্রকৃত সুখ কাহাকে বলে, স্বপ্নেও অনুভব করি নাই। অথবা, আমি বলিয়া নহে; সকলেরই এই দশা; আমি যেমন স্বয়ং কস্মিন্ কালেও বলিতে কি, কিছু-মাত্র সুখ অনুভব করি নাই, সেইরূপ কাহাকেও অনুভব করিতে দেখি নাই ও শ্রবণও করি নাই। ব্যক্তিমাত্রেই যদি স্ব স্ব বয়স ও তৎসহকারে ঐরূপ দিন গণনা করিয়া, সবিশেষ বিচারসহকারে পর্য্যালোচনা করে, তাহা হইলে, অনায়াসেই বুঝিতে পারে, তাহার জীবনে কতদিন প্রকৃত সুখ ভোগ সংঘটিত হইয়াছে? আমি নিশ্চয় করিয়া ও দিব্য করিয়া বলিতে পারি, আমার ন্যায়, একদিনের জন্যও তাহার সুখভোগ হয় নাই! কেন হয় নাই, বলিতেছি, শ্রবণ কর ও শ্রবণ করিয়া, এই মুহূর্ত্তেই এই পাপসংসার পরিহার কর এবং যেখানে কোনরূপ উপদ্রব ও অত্যাচারের কথা নাই, সেই শান্তিনিকেতনে সমাগত হইয়া, নির্ব্বাণসুখ ভোগ করিবার চেষ্টা কর। যে সুখ ও যে সন্তোষ এখানে প্রাপ্ত হইলে না, অবশ্যই অতি অবশ্যই সেখানে তাহা প্রাপ্ত হইবে।

আমি আর অধিক তোমাকে কি বলিব? বিধাতা আমার জন্য তোমাকে ও তোমার জন্য আমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। আমিও তোমাকে হৃদয়ের সহিত ও প্রাণের সহিত স্নেহ করি, মমতা করি ও প্রীতি করি। কিন্তু পৃথি-বীতে পাপ, পৃথিবীতে মনুষ্যের ভালবাসা, নানাকারণে স্থায়ী হইতে পারে না; শতদিকে শতরূপে তাহার ব্যাঘাত ও প্রতিঘাত হইয়া থাকে। এইজন্য পণ্ডিতেরা ভূয়োভূয়ঃ মনুষ্যের অসার ভালবাসা পরিহার করিয়া, ঈশ্বরের অনুরাগ

প্রীতি ও ভালবাসা সঞ্চয় করিতে উপদেশ করিয়াছেন। কেননা, তাহাতে সুখের সীমা নাই। দেখ, আমি তোমায় ভাল বাসিতাম। কিন্তু তাহার পরিণাম কি ভয়াবহ হইল! পাপসংসারের পাপলোক পাপচক্ষুতে তাহা দেখিতে বা পাপ প্রাণে তাহা সহ্য করিতে পারিল না। অমৃতে বিষ-সমুদ্ভূত হইল; আলোক অন্ধকারে পরিণত হইল; স্বর্ণ সঞ্চয় করিতে ধূলিমুষ্টি সংগৃহীত হইল! ইহা অপেক্ষা ক্লেশের, বিষাদের ও অতিদুঃখের বিষয় আর কি আছে বা হইতে পারে? অথবা, যে সংসারে অধর্ম্ম ধর্ম্মের সিংহাসন হরণ করিয়া, একাধিপত্য বিস্তার করিয়াছে, তাহার পরিণাম এইরূপই ভয়াবহ, শোকাবহ, দুঃখাবহ ও বিষাদবহ হইয়া থাকে! এই কারণেই এই মর্ত্ত্যলোকে শোকদুঃখ-শতপূর্ণ পাপলোকে তিলার্দ্ধও অবস্থিতি করিতে আমার আর অণুমাত্র ইচ্ছা নাই। অতএব এই মুহূর্ত্তেই ইহা ত্যাগ করিব। তুমিও ত্যাগ করিবার চেষ্টা কর। ঐ দেখ, স্নেহময়ী জননীকে ইতিপূর্ব্বেই বলপূর্ব্বক এই পাপলোক হইতে পরিহার প্রদান করিয়াছি। এতদিনে ইহাঁর আত্মা মুক্ত হইল, সুখী হইল, স্বস্থ ও প্রকৃতিস্থ হইল! আমরাও উভয়ে এইরূপ হইব, চল, আর কেন অপেক্ষা করিতেছ? কি আশয়ে ও কি অভিপ্রায়েই বা অপেক্ষা করিতেছ? ধিক্ আমাকে ও ধিক্ তোমাকে!

বলিতে বলিতে তাহার অধরোষ্ঠ প্রস্ফুরিত হইয়া উঠিল। কপালে ও কপোলে মুক্তা ফলস্থূল ঘর্মবিন্দু সকল সঞ্চরিত হইল, লোচনযুগল বাষ্পভরে আচ্ছন্ন হইয়া গেল।

কান্দিবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু কান্দিলেন না। অতিকষ্টে আত্মসংবরণ করিয়া, শুষ্কমুখে শূন্যনয়নে উদাসীনের ন্যায়, আমার দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভগবন্! তাঁহার তৎকালীন সেই শোচনীয় মত্তমূর্ত্তি আজিও আমার চিত্তপটে নূতনরাগে রঞ্জিত রহিয়াছে। আমি মরিলেও, তাহা ভুলিতে পারিব না। অনেকবার ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু কিছুতেই ভুলিতে পারি নাই। কাল সকলই করিতে পারে। দেখুন, দুরন্ত কালবলে পাষাণও কর্দ্দম হয়, অগ্নিও জল হয় ও বিষও অমৃত হয়, আবার, কর্দ্দমও পাষাণ, জলও অগ্নি ও অমৃতও বিষ হইয়া থাকে। এইরূপে যাহা অসম্ভব, তাহা সম্ভব এবং যাহা সম্ভব, তাহা অসম্ভব হয়। সুতরাং, কালই সকল বস্তুর আবির্ভাব ও তিরোভাব সংঘটিত করে। কালকৃত এবংবিধ নিয়তির পরিহার বা ব্যভিচার কোন দেশের কোন ব্যক্তিতেই সম্ভব বা সাধ্য নহে। আমি ইহাই ভাবিয়া, মনকে প্রবোধ প্রদান পূর্ব্বক কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত করিয়া থাকি। সত্য বটে, আমি যে পথে পদার্পণ করিয়াছি, তাহাতে শোকের চিন্তার ও কোনরূপ অসুখের লেশ নাই; কিন্তু আমি সহজবুদ্ধিতে এই পথ আশ্রয় করি নাই, ভাবিয়া, সময়ে সময়ে আমার মন সহসা মত্তবৎ, উদ্দামবৎ, বিচরণ করে। তৎকালে যে বিকার বিশেষের আবির্ভাব হইয়া, আত্মাকে অস্থির করে, এই দেবী ভগবতীর শ্রীশ্রী পদারবিন্দ পর্য্যবলোকন করিয়া, তাহা নিবারণ করিয়া থাকি। এই পদারবিন্দ পরিদর্শনই আমার নির্ব্বিকল্প সমাধি। ভগবন্! হতভাগিনী আমি এতাবৎকাল এই-

রূপে পাপপুণ্য সুখদুঃখময় অপূর্ব্ব জীবন যাপন করিয়া আসিতেছি। সত্য বটে, দেবীর প্রসাদে আমার সমুদায় জ্ঞানবিজ্ঞান, সমুদায় ধর্ম্ম নীতি, সমুদায় যোগ বিয়োগ এবং এবং সমুদায় আচার বিচার সবিশেষ বিদিত হইয়াছে; কিন্তু আজিও আমার সুখ দুঃখের অবসান হয় নাই। যে দিন এই সুখ দুঃখের অবসান হইবে, সেই দিন জানিবেন. আমার মুক্তি হইয়াছে, অগস্ত্য কহিলেন, কল্যাণি! আমার মতে তোমার এই সুখ দুঃখ সর্ব্বথা প্রার্থনীয়। দেখ, তোমার ন্যায় সতী পতিব্রতা রমণীরা যদি স্ব স্ব স্বামীকে স্মরণপথের বহিষ্কৃত করেন, তাহা হইলে, বিধাতার অতি-যত্নকৃত দাম্পত্য সৃষ্টির ব্যাঘাতবশতঃ সংসারে বিষম বিপরিণাম সংঘটিত হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। অতএব নির্ব্বিকারচিত্তে শেষ ঘটনা বলিয়া যাও।

উলূপী কহিলেন, ভগবন্! অবধান করুন। আমার স্বামী সেইরূপে শূন্যদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, আমি অতি কারুণ্যজনিত মোহবিশেষের আবির্ভাবপ্রযুক্ত বাক্‌নিষ্পত্তি-বিরহিত হইয়া, কাষ্ঠপুত্তলিকার ন্যায় দণ্ডায়মান রহিলাম। কি করিলে ও কি বলিলে ভাল হয়, কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। অনন্তর দুর্ভর মনোবেগ সংবরণ করিতে না পারিয়া, কুররীর ন্যায়, উন্মাদিনীর ন্যায়, উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়া উঠিলাম। স্ত্রীজাতি স্বভাবতঃ অতীব কোমল প্রকৃতি। শতশঃ বুদ্ধি থাকিলেও, বালকের ন্যায়, কান্দিয়া থাকে। বিশেষতঃ, আমি যে অবস্থায় পতিত হইয়াছিলাম, তাহা কিরূপ ভয়াবহ ও শোচনীয়, তাহা আপনার ন্যায়,

সর্ব্বদর্শী মহর্ষিকে বিশেষ করিয়া বলা বাচালতামাত্র। মানুষমাত্রেই বিপদে পড়িলে, অবসন্ন হয়। এ বিষয়ে স্ত্রীপুরুষ প্রভেদ নাই। এইজন্য শাস্ত্রকারেরা কহিয়াছেন, বিপদে ধৈর্য্য ও সম্পদে ক্ষমাই এই দুইটীই প্রকৃত মনুষ্যত্ব। কিন্তু সংসারে কয়জন প্রকৃত মনুষ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকেন?

অগস্ত্য কহিলেন, কল্যাণি! বলিয়া যাও, তোমার কথায় আমার কিছুমাত্র অবিশ্বাস বা আকাঙ্ক্ষা নাই। আমার কেবল ইহাই জানিতে অতিমাত্র কৌতূহল হইয়াছে, যে, তোমার স্বামী ও তুমি তার পর কি করিলে? ভাবিয়া দেখিলে, তুমি অবশ্য অতি শোচনীয় অবস্থায় পতিত হইয়াছিলে। সংসারী ব্যক্তির পক্ষে ইহা অপেক্ষা বিপদ আর কি আছে?

উলূপী কহিলেন, ব্রহ্মন্! আমিই এই সমস্ত অতীব জুগুপ্সিত অতীব শোকাবহ ও অতীব ভয়াবহ ঘটনার একমাত্র কারণ, তৎকালে ইহাও চিন্তা করিয়া, আমার উদ্বেগ ও বিহ্বলতা আরও বর্দ্ধিত হইল। ভাবিলাম, পাপীয়সী আমি না বুঝিয়া, না ভাবিয়া ও না জানিয়া, কি অত্যাহিত অনুচিত অনুষ্ঠান করিলাম! একমাত্র আমার বুদ্ধিদোষে শ্বশ্রূদেবী অকারণ হত্যামুখে নিপতিত হইলেন; স্বামীর অতিমাত্র শোচনীয় মত্তভাব উপস্থিত হইল এবং শ্বশুরকুল ও পিতৃকুল উভয়েরই জলপিণ্ড লোপাপত্তি প্রাপ্ত হইল! ব্যাকুলহৃদয়ে, বিষণ্ণবদনে, ও ম্লানচিত্তে এইপ্রকার চিন্তা করিতেছি, আর, অনর্গল বিগলিত অশ্রুসলিলে গণ্ডস্থল

প্লাবিত ও ধরাতল অভিষিক্ত হইতেছে, এমন সময়ে আমার স্বামী পুনরায় আমাকে মৃদুবাক্যে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, অয়ি মুগ্ধে! তুমি এখনও এই পাপপৃথিবী পরিহার করিলে না? আমি সত্য বলিতেছি, এখানে সুখ নাই, সন্তোষ নাই, আত্মীয়তা নাই ও অন্তরঙ্গতা নাই। যদি চিরকাল কান্দিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে, এখানে অবস্থিতি কর। তুমি গৃহে গৃহে অন্বেষণ করিয়া দেখ, ব্যক্তিমাত্রেই কোন না কোনরূপে ক্রন্দন করিতেছে। কেহ উদরের চিন্তায়, কেহ পরিবারের ভাবনায়, কেহ প্রভুর তাড়নায়, কেহ উত্তমর্ণের শাসনে, কেহ রোগের যন্ত্রণায়, কেহ অর্থের অভাবে, কেহ চৌরাদির ভয়ে, কেহ রাজাদির দণ্ডে, কেহ লোকলাঞ্ছনায়, কেহ মান লাঘবে, কেহ গৌরবের ক্রটিতে, কেহ বাদীর নিকট পরাজয়ে, কেহ শত্রুর প্রাদুর্ভাবে, কেহ মিত্রের দুর্ব্বলতায়, কেহ বন্ধু বান্ধবের অপচয়ে, কেহ ব্যবসায় বাণিজ্যের অবনতিতে, কেহ প্রতিযোগিতার দুরতিক্রম্য আক্রমণে এবং কেহ বা এতৎসদৃশ অন্যবিধ কারণে ক্রন্দন করিতেছে। এইরূপে সমস্ত সংসারই দিবারাত্র ক্রন্দন করিতেছে। কেহ প্রকাশ্যে ও কেহ গোপনে ক্রন্দন করিয়া থাকে। বলিতে কি, অনেকে গাঢ়তর নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্নাবেশে ক্রন্দন করিয়া উঠে। ইহাতে সুস্পষ্ট বুঝিয়া লও, কোনকালে কোনদেশে ও কোন ব্যক্তিতেই এই ক্রন্দনের পরিহার নাই। প্রতি গৃহ, প্রতি হৃদয়, তদাদি-তদন্তরূপে অন্বেষণ কর; সুস্পষ্ট দেখিতে পাইবে, এই ক্রন্দন কোন না কোনরূপে তথায় বাস করিতেছে।

ধনীর প্রাসাদ, দরিদ্রের কুটীর, মধ্যবিত্তের গৃহ, সর্ব্বত্রই ইহার প্রসার লক্ষিত হইয়া থাকে। একজন পণ্ডিত যেমন একজন মূর্খ তেমন ক্রন্দন করে। তবে, পণ্ডিতের ক্রন্দন সহসা বা সহজে লক্ষিত হয় না। এইমাত্র বিশেষ।

পাপসংসারে মনের কথা খুলিয়া বলা রীতি নাই। ইহার উপর আবার দ্বেষ, ঈর্ষা ও হিংসার দুরন্ত প্রভাব এবং অভিমান ও অহঙ্কারের দারুণ একাধিপত্য। সেইজন্য, লোকে আপনার অপেক্ষা অন্যকে সুখী মনে করে এবং তজ্জন্য তাহার হৃদয়ের ক্রন্দন ও অন্তরের দুঃখ তাহার লক্ষ হয় না। আমি জীবনের এই পঞ্চবিংশতিবর্ষ প্রতিদিনই ক্রন্দন করিয়াছি। একদিনের জন্যও পরিহার প্রাপ্ত হই নাই। বলিতে কি, যাহাদের সহিত আমার আলাপপরিচয় ও আদানপ্রদানাদি ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে এবং তজ্জন্য আমি যাহাদের অন্তরের সংবাদ কোন না কোনরূপে জানিয়া থাকি, আমার বিলক্ষণ স্মরণ আছে, এই সুদীর্ঘকালের মধ্যে মধ্যে তাহাদের একজনকেও একদিনের জন্য ক্রন্দনশূন্য অবলোকন করি নাই। আমি বলপূর্ব্বক বা নিজের পাণ্ডিত্য প্রখ্যাপনজন্য, অথবা অনর্থক বাগাড়ম্বর মানসে, কিংবা তোমাকে প্রলোভিত করিবার অভিপ্রায়ে, অথবা মূর্খতা ও মত্ততাবশতঃ এইপ্রকার বলিতেছি না। তুমিই ভাবিয়া দেখ, মানুষ যখন ভূমিষ্ঠ হয়, তৎকালে ক্রন্দন করিয়া উঠে। ইহার কারণ কি? পণ্ডিতেরা ইহাই দেখিয়া নির্ণয় করিয়াছেন, যে, সংসার কেবল ক্রন্দনেরই স্থল। বলিতে কি, প্রতিদিন প্রতিক্ষণে প্রতিমুহূর্ত্তেই এই রণ্যভূভূমি-সংসারে

ক্রন্দনের এরূপ শত শত কারণ উপস্থিত হইয়া থাকে যে, নিতান্ত আত্মদর্শী না হইলে, আর তাহা পরিহার করিতে পারা যায় না। সত্য বটে, অনেকে ক্রন্দন করে না। কিন্তু কেন করে না, তাহা কি তুমি ভাবিয়া থাক? প্রতিদিন ক্রন্দন করিয়া, তাহাদের অভ্যাস বদ্ধমূল হইয়াছে। এইজন্য তাহারা আর সামান্য কারণে বা সামান্য সূত্র সংঘটনমাত্রেই ক্রন্দন করে না। ইহাই এবিষয়ের একমাত্র কারণ।

সংসারে এমন অনেক নির্লজ্জ পামর আছে, যাহারা কাক ও কুক্কুরের ন্যায়, অনবরত তাড়িত ও পদাহত হইলেও, কোনমতেই অপমানিত ও অপ্রতিভ বোধ করে না। ইহার কারণ কি? অনবরত অপমান সহ্য করিয়া, তাহাদের হৃদয় বেদনাশূন্য, স্তব্ধভাবাপন্ন ও কির্ণাচ্ছন্ন হইয়াছে। সেইজন্য অপমানে আর অপমান বোধ হয় না। অনেকে ঐরূপ অপমান বা বিকার যন্ত্রণাকে সাক্ষাৎ অনুগ্রহ বা প্রসাদ মনে করিয়া থাকে এবং তজ্জন্য তাহা কায়মনে প্রার্থনা করে। যাহার হৃদয় এইরূপ স্তব্ধ ও চেতনাবৃত্তি পরিশূন্য, সে যে ক্রন্দনের কারণসত্ত্বেও সহজে ক্রন্দন করিবে, তাহা কখন সম্ভব নহে। এইজন্য অনেক স্থলে অনেক সময়ে এবিষয়ের ব্যভিচার লক্ষিত হয়। পাষাণহৃদয় দ্রবীভূত বা গলিত হওয়া সহজব্যাপার নহে।

যাহা হউক, যে সংসারের পরিণাম এইপ্রকার ভয়াবহ, সেই হতদগ্ধ-পাপসংসার এই মুহূর্ত্তেই পরিত্যাগ করা সর্ব্বতোভাবেই কর্ত্তব্য। ঐ দেখ, ইহার চতুর্দ্দিকে রোগ, শোক, জরা, বার্দ্ধক্য, বিষাদ, অবসাদ, সন্তাপ, পরিতাপ, আত্মগ্লানি,

মনোহানি, আধিব্যাধি, যন্ত্রণা, বেদনা, যেন মূর্ত্তিমান্ হইয়া, হাহাকারে বিচরণ করিতেছে। কখন্ কাহাকে গ্রাস করে, বলা যায় না। ঐ দেখ, শত শত ব্যক্তি উহাদের করাল কবলে পতিত হইয়া কিরূপ বিপন্ন ও অবসন্ন হইয়াছে! ঐ দেখ, ইহাদের তাড়নায় ও বিভীষিকায় লোকালয়ে সুখ-স্বাস্তি, জম্বুকাদির ন্যায়, প্রবেশ করিতে একবারেই অসমর্থ হইয়াছে। ক্বচিৎ কদাচিৎ প্রবেশ করিলেও, তৎক্ষণে ব্যাধতাড়িত মৃগের ন্যায়, অন্তর্হিত হইয়া থাকে। ঐ দেখ, ঘনঘোর গভীর অন্ধকার যেন ইহার চতুর্দ্দিক্ আচ্ছন্ন করিয়া সবেগে ঘূর্ণায়মান হইতেছে। ঐ দেখ, গৃহে গৃহে যেন দারুণ অগ্নি প্রজ্বলিত হইতেছে। ঐ দেখ, লোকে ঐ অন্ধকারে হতদৃষ্টি ও হতজ্ঞান হইয়া, এই অগ্নিতে পতঙ্গবৎ পতিত ও দহ্যমান হইতেছে। কত স্ত্রী, কত পুরুষ, কত বালক, কত যুবা, কত বৃদ্ধ, কত গ্রাম, কত নগর, কত পশু, কত পক্ষী ঐরূপে দগ্ধ ও উপরত হইয়াছে, তাহা বলিবার নহে। সাবধান, তুমিও যেন দগ্ধ হইও না। দগ্ধ হইলে, অপমৃত্যুজনিত নিরয় লাভ ও আত্মভ্রংশ অবশ্যম্ভাবী, এবিষয়ের কোনরূপ সন্দেহ নাই। এ দারুণ অনলের কোনপ্রকার শীতল ক্রিয়া নাই। যাহারা দগ্ধ হইয়াছে, তাহারা জীবনে যেমন, মরণেও তেমন অহরহ জ্বালাতন হইয়া থাকে। পাপসংসারই এই অনলের জন্মভূমি। স্বর্গে ইহার কোনরূপ সম্পর্ক নাই। অতএব তুমি সেই স্বর্গলাভে সচেষ্ট হও। এই মুহূর্ত্তেই পাপ মনুষ্যলোক ত্যাগ কর। বলিতে কি, যে সুখ বা যে স্বস্তি ইহলোকে প্রাপ্ত

হইলে না ; স্বর্গে সেই পরম পিতার নিকট তাহা প্রাপ্ত হইবে, সন্দেহ নাই।

বলিতে কি, আমি যাবজ্জীবন ঐ দুরন্ত অনলে অসহায় পতঙ্গবৎ দগ্ধ হইয়াছি এবং অহোরহ মর্ম্মে মর্ম্মে দারুণ বেদনা অনুভব করিয়াছি। অনেক চেষ্টা করিয়াছি, কিছু-তেই ইহার পরিহার করিতে পারি নাই। বহুদিনের পরি-দর্শনে বা অনেক দেখিয়া শুনিয়া অধুনা স্পষ্টই অনুভূত ও জ্ঞানগোচর হইয়াছে যে, সংসার ত্যাগ না করিলে, কোন মতেই ইহার পরিহার হইবে না। এই অনল বহুভাগে ও বহুশাখায় বিভক্ত। তন্মধ্যে জঠরানল, কামানল, তৃষ্ণা-নল, এই তিনটী শাখা প্রধান। জঠরানল প্রজ্বলিত হইলে, স্নেহময়ী জননীও রাক্ষসীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া থাকেন, অন্যের কথা আর কি বলিব? অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টি সংঘটিত হইয়া, দুর্ভিক্ষ উপস্থিত করিলে, এই জঠরানলের প্রলয়-লীলা সুস্পষ্ট অভিনীত হইয়া থাকে। ঐ দেখ, এই কুক্কুর জঠরানলে দহ্যমান হইয়া, দ্বারে দ্বারে বিচরণ করিতেছে। ঐ দেখ, আবার এদিকে চাহিয়া দেখ, জঠরানলের দুরন্ত জ্বালায় অস্থির হইয়া, একজন হতভাগ্য সবেগে ইহার অনু-করণ করিতেছে। ধনীর দ্বারে বা দাতার গৃহে গমন কর, দেখিতে পাইবে, কুক্কুর ও কাক যেমন শত শত ভিক্ষু তেমন সামান্য উচ্ছিষ্ট প্রার্থনায় লালায়িত হইয়া, একমনে আসীন রহিয়াছে এবং কখন বা পরস্পর বিবাদ করিতেছে। ইহা অপেক্ষা জঘন্য, ঘৃণ্য ও অগণ্য ব্যাপার আর কি আছে বা কি হইতে পারে? আমিও এই জঠরানলে দগ্ধ ও মত্ত

হইয়া, কতবার কত কুকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়াছি ; সে সকল ভাবিলেও, এখন মনে মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণার সঞ্চার হইয়া থাকে। এই দেখ, অনবরত ধনুর্ব্বাণ ধারণ করিয়া, আমার হস্ত কি শঙ্কিত হইয়াছে। এই দেখ, অনবরত ভারবহন করিয়া, আমার স্কন্ধদেশ স্থূল ও স্ফীত হইয়াছে। এই দেখ, অনবরত রৌদ্রে রৌদ্রে বিচরণ করিয়া আমার কলেবর দুরন্ত কালিমায় অতীব দুর্দ্দর্শ হইয়াছে। এই দেখ, অনবরত বনে বনে ভ্রমণ করিয়া, আমার পদতল লৌহবৎ কঠিন হইয়াছে। এই দেখ, অনবরত কুক্কুর প্রভৃতি ইতর পশুর সহিত বাস করিয়া, আমার মতি গতি ও স্বভাব চরিত্র নিতরাং বিকৃত হইয়াছে। ফলতঃ, আমাতে আর কিছুমাত্র মনুষ্যত্ব নাই। ইহার কারণ কি ? একমাত্র জঠরানল।

শুদ্ধ আমি বলিয়া নহে, সংসারে মনুষ্যমাত্রেরই এই দশা। জীব জাতমাত্রেই দারুণ জঠরানলে আক্রান্ত ও মৃত্যু পর্য্যন্ত দহ্যমান হইয়া থাকে। একদিনের জন্যও তাহার পরিহার নাই। যেখানে যাইবে, সেইখানেই দেখিতে পাইবে ; এই ক্ষুধা রাক্ষসীর ন্যায় বিচরণ করিতেছে এবং কালরাত্রির ন্যায়, সকলকেই আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। আমি অত্যুক্তি বা অতিবাদ করিতেছি না। অতএব তুমি এই পাপ সংসার পরিহার কর এবং যাহাতে সেই দিব্যধামে গমন করিতে পার, তজ্জন্য সচেষ্ট হও। আমি বারংবার বলিতেছি, সেখানে এরূপ সর্ব্বনাশকরী আত্মনাশকরী ক্ষুধা নাই এবং স্বর্গনাশকরী, স্বার্থনাশকরী তৃষ্ণা নাই।

হায় মনুষ্যলোক কি ভয়াবহ! তাহাদের অবস্থা কি শোচনীয়! চতুর্দ্দিকে রোগ, শোক,অকালমৃত্যু হাহাকারে বিচরণ করিতেছে। কখন্ কোন্ মুহূর্ত্তে গ্রহণ করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। তথাপি, তাহারা যেন মরিবে না, এই ভাবে স্ত্রী পুত্র লইয়া, দিবারাত্র আমোদ প্রমোদ করিতেছে। অগ্নিময় গৃহমধ্যে বদ্ধ থাকিয়া, সুখশান্তির আশা করা কখনও সম্ভব হয় না। নিতান্ত জড়বুদ্ধি বা মত্ত না হইলে,আর ঐ প্রকার শুষ্কশূন্য আশাপাশে বদ্ধ হওয়া যায় না। ইহাতেই বুঝিয়া লও, মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি ও জ্ঞান বিবেচনার লেশমাত্র আছে কি না এবং তাহার অধিষ্ঠিত এই পাপ পৃথিবীতেও প্রকৃত শান্তিসুখসংঘটন সম্ভব কি না? অতএব তুমি এই মুহূর্ত্তেই ইহা পরিত্যাগ কর। পরলোকে পুনরার উভয়ের মিলন হইবে। ঐ দেখ, পরমপুণ্যকারিণী শুদ্ধচারিণী জননী ইতিপূর্ব্বে ইহা ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। আর তাঁহাকে পাপতাপ ভোগ করিয়া, মর্ম্মে মর্ম্মে আহত ও অভিহত হইবে না।

এই কথা বলিতে বলিতে সহসা তাহার বাক্‌শক্তি রুদ্ধ হইয়া গেল এবং চক্ষুর্দ্বয় আরও লোহিতবর্ণ হইল। তিনি স্খলিত স্বরে কহিলেন, আমাকে ধর। অসহ্য-মস্তক-বেদনায় আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে। এই কথায় অতিমাত্র ব্যাকুল ও বিহ্বল হইয়া, আমি যেমন কম্পিত হস্তে তাঁহাকে ধরিতে গেলাম, তৎক্ষণাৎ তিনি ছিন্নমূল বৃক্ষের ন্যায়, ধরাতলে পতিত হইলেন। তদ্দর্শনে আমি অস্তে ব্যস্তে তাঁহাকে উত্থান করাইয়া, অতি যত্নে ক্রোড়ে ধারণ করিলাম। ভগ-

বন্! পাপিনী আমি, বরাকী আমি, হতভাগিনী আমি জীব-নের—এই পাপজীবনের সেই একদিন মাত্র স্বামীসমাগমরূপ অসুলভ সৌভাগ্যযোগ ভোগ করিতে সমর্থা হইয়াছিলাম। আজিও আমার সেই শুভদিন ও সেই শুভক্ষণ স্মরণপথে প্রত্যক্ষ বিরাজমান রহিয়াছে। বলিতে কি, তাদৃশী শোচ-নীয় অবস্থাতেও তদীয় কলেবর স্পর্শ করিয়া; আমি যেন অমৃতময় হ্রদে অবগাহন করিলাম। আমার আত্মার যেন পূর্ণানন্দ উপস্থিত হইল। মনে হইল, বারংবার আলিঙ্গন করিয়া, অন্তরের তাপ সন্তাপ সমুদায় জন্মের মত দূরীকৃত করি।

কিন্তু মানুষের, হতভাগ্য মানুষের সংকল্প কখন সিদ্ধ হয় না। সে যাহা ভাবে, তাহার বিপরীত হয়। সে যে দিন সুখে থাকিব ও সুখে খাইব, মনে করে, সেই দিনই তাহার দারুণ দুঃখ উপস্থিত ও অনশনে বা অর্দ্ধাশনে অতীত হইয়া থাকে। ইহারই নাম মানুষের মূর্ত্তিমতী অসারতা। তথাপি, মানুষের জ্ঞান নাই, চৈতন্য নাই। সে প্রাতঃকাল ভাল দেখিলে, অনায়াসেই মনে করে, সন্ধ্যাকালও এই-রূপ ভাল হইবে। কিন্তু তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইয়া থাকে। অথবা, আপনার ন্যায়, জ্ঞানবিজ্ঞানপারদর্শী ঋষিকে আর অধিক বলিবার আবশ্যকতা নাই। সকল মনু-ষ্যের যে দশা বা যে গতি,আমার তাহাতে অন্যথা বা ব্যভি-চার হইবে কেন? সুতরাং, আমি যাহা সংকল্প করিলাম, তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত হইল। আমি সেইরূপে স্বামীরে ক্রোড়ে ধারণ করিয়া দেখিলাম, তাঁহার চেতনা লুপ্ত, সর্ব্ব-

শরীর স্পন্দশূন্য ও হিমশীতল, লোচনযুগল মুদ্রিতপ্রায় ও সর্ব্বথা প্রতিভাবিবর্জ্জিত এবং মুখমণ্ড প্রভাতকালীন চন্দ্রমণ্ডলবৎ মলিন ও একান্ত শোচনীয় ভাবাপন্ন। তদ্দর্শনে আমি মনে করিলাম,অতিমাত্র শ্রান্তিবশতঃ তাঁহার অবসাদবিশেষ উপস্থিত হইয়াছে। সমুচিত শুশ্রূষা করিলেই, সুস্থ হইবেন। এইপ্রকার মনে করিয়া, ধীরে ধীরে সুকোমল বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাঁহার মুখমণ্ডল অতি যত্নে মার্জ্জিত করিয়া,বীজন করিতে লাগিলাম এবং এক এক বার শূন্যশুষ্ক ব্যাকুল নয়নে দেখিতে লাগিলাম, তাঁহার চেতনার সঞ্চার হইতেছে কি না ?

ভগবন্! সংসারে আশার প্রলোভন অতি ভয়াবহ। লোকে এই আশার প্রলোভনে অন্ধ ও অনায়ত্ত হইয়া, ভস্মকেও স্বর্ণরেণু বলিয়া মনে করে এবং বিষকেও অমৃত ভাবিয়া, পান করিতে উদ্যত হয়। আমারও তাহাই ঘটিল। স্বামী তৎক্ষণেই ইহলোক ত্যাগ করিয়া, হতভাগিনী আমাকে আরওহতভাগিনী করিবেন ; আমি আশার প্রলোভনে অন্ধ হইয়া, তাহা বুঝিলাম না। সবিশেষ শুশ্রূষা করিলেই, সংজ্ঞালাভ হইবে এবং সংজ্ঞা লাভ হইলেই, উত্থিত হইয়া, আমারে ক্রোড়গতা করিবেন। তাহা হইলেই, আমি চিরসুখিনী হইব। আমি তৎকালে এইরূপ অন্ধ ও অবশ আশাতেই মত্তা ও বিহ্বলা হইয়াছিলাম।

অগস্ত্য কহিলেন,সুভগে ! তুমি যদি তৎকালে জানিতে পারিতে যে, তোমার স্বামী তৎক্ষণে পরলোক গমন করি-

বেন; তাহা হইলে, তুমি কি তাঁহাকে বাঁচাইতে পারিতে? কখনই না। তবে কেন তুমি ঐরূপ আশা করিয়াছিলে, বলিয়া, অনুতাপ করিতেছ?

উলূপী, কহিলেন, ব্রহ্মন্! মিথ্যার সমান পাপ নাই, অহংকারের সমান শত্রু নাই; এবং আশার সমান বন্ধন নাই। এই আশাই মানুষের মুক্তিপথের বিষম ব্যবধান এবং সুখস্বস্তির সাক্ষাৎ দুর্নিবার বিঘ্ন। এইজন্য শাস্ত্রকারেরা আশা ত্যাগে বারংবার উপদেশ করিয়াছেন। তাঁহারা বলেন, মানুষের যদি কিছু আশার সামগ্রী থাকে, তাহা হইলে, তাহা একমাত্র পরমার্থ ও পুরুষার্থ। কেন না, সংসারের কোন বস্তুই স্থায়ী ও তজ্জন্য পরিণামসুখাবহ নহে। এই জন্য তাহাতে আমরা বদ্ধ হইলে, পরিণামে অবশ্যই বিড়ম্বিত ও বঞ্চিত হইতে হয়। ঐরূপ বঞ্চনার বেগধারণ বা গুরুতর আঘাত সহ্য করা কোনমতেই সুসাধ্য নহে। উহাতে পাষাণবৎ অতিকঠিন হৃদয়ও কর্দ্দমবৎ অনায়াসেই বিদলিত ও বিদ্রাবিত হইয়া থাকে। এই বিষয়ের শত শত দৃষ্টান্ত অসুলভ নহে। কতলোক আশা ভঙ্গজনিত দুর্নিবার মনোবেগের গুরুতর আঘাতে অসহমান ও অনায়ত্ত হইয়া, জলে, অনলে, উদ্বন্ধনে, বিষমূর্চ্ছনে এবং তৎসদৃশ বা ততোধিক অতীব জুগুপ্সিত বিধানে আত্মহত্যা ও পরকেও হত্যা করিয়া, অনন্ত নরক লাভ করিয়াছে ও করিতেছে, তাহা বলিবার নহে। ভগবন্! এই জন্যই আমি পাপতাপশতময়ী আশার নিন্দা করিতেছি। বাস্তবিক, আমি সেইরূপ আশা করিয়া, তৎকালে যে বঞ্চিত

ও গুরুতর আহত হইয়াছিলাম, তাহা ভাবিলে, এখনও কলেবর লোমাঞ্চিত আত্মা চকিত হইয়া উঠে।

অগস্ত্য কহিলেন, কল্যাণি! বুঝিলাম, যেখানে আশা, সেই খানেই বন্ধন। মানুষ এই আশার দাস হইয়া, রণে, বনে, অগ্নিমধ্যে ও শত্রুসমবায়েও বিচরণ করিতে কুণ্ঠিত হয় না। এই আশা, দুরন্ত কুজ্ঝটিকার ন্যায়, তাহার জ্ঞানালোক আচ্ছন্ন করিয়া থাকে। তোমারও তাহাই ঘটিয়াছিল। অতএব তন্নিবন্ধন কোনরূপ অনুতাপ করিবার আবশ্যকতা নাই। তুমি যে অধুনা দেবীর প্রসাদে আশাপাশ ছেদন করিয়া, মুক্ত হইয়াছ, ইহাই পরমসৌভাগ্য বোধ করিয়া, দুখিনী হও এবং প্রস্তাবিত বিষয়ের উপসংহার কর। শুনিবার জন্য সবিশেষ কৌতূহল উদ্বুদ্ধ হইয়াছে।

উলূপী কহিলেন, ব্রহ্মন্! অবধান করুন। আমি সেইরূপে শুশ্রূষা করিতেছি, এমন সময়ে সহসা অবলোকন করিলাম, তাঁহার নাসিকা ও মুখ হইতে শোণিতস্রাব হইতেছে, এবং গ্রীবাদেশ যেন ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। তদ্দর্শনে আমার প্রাণ উড়িয়া গেল। কিন্তু তখনও পাপীয়সী আশাপিশাচী আমাকে ত্যাগ করে নাই। আমি তখনও তাহার প্রলোভনে অন্ধ হইয়া, মনে করিলাম, হয়ত, কোনরূপ আঘাত লাগিয়াছে। সেইজন্য শোনিতস্রাব হইতেছে। এই ভাবিয়া, আস্তে ব্যস্তে বস্ত্র দ্বারা সেই বিগলিত শোণিতরাশি মার্জ্জিত করিতে লাগিলাম। অনন্তর শোণিতস্রাববন্ধ হইলে, সভয়ে ও সকম্পে তাঁহার কপালে ও কপোলে এবং বক্ষস্থলে হস্ত দিয়া দেখিলাম; উহা

একবারেই শীতল হইয়া গিয়াছে। তখন হতভাগিনী আমি নিশ্চয় বুঝিলাম, জীবিতেশ্বর আর জীবিত নাই ; ইহজন্মের মত মর্ত্ত্যভূমি ত্যাগ করিয়া, দিব্য লোকে গমন করিয়াছেন। আমিও জন্মের মত অনাথিনী হইয়াছি ! এইপ্রকার অবধারণ করিয়া, করুণাবিশেষের আবির্ভাব হওয়াতে, আমি আর কোন মতেই স্থির থাকিতে পারিলাম না। বিষদিগ্ধ-শল্য-বিদ্ধা মৃগীর ন্যায়, একান্ত অসহমানা হইয়া, উচ্চৈঃস্বরে ক্রন্দন করিয়া উঠিলাম এবং এই বলিয়া বিলাপ করিতে লাগিলাম। হায়, আমি হত হইলাম ! হায়, আমি দগ্ধ হইলাম ! হায়, আমার কি হইল ! হা মাতঃ ! হা তাত ! তোমরা কোথায় !

অনন্তর দৃঢ়করে স্বামীর চরণযুগল ধারণ করিয়া, কাতর স্বরে বলিতে লাগিলাম,নাথ ! তুমি এই হতভাগিনীকে একাকিনী পরিত্যাগ করিয়া, কোথায় গমন করিতেছ ? আমি তোমাকে ত্যাগ করিয়া,কোন মতেই থাকিতে পারিব না। অতএব আমারে সমভিব্যাহারিণী কর। হায়, আমি সর্ব্বথা অনাথা হইলাম ! আমার আর আশ্রয় কৈ ? অবলম্বন কৈ ? উপায় কৈ ? অভিভাবক কৈ ? বৃক্ষ পতিত হইলে,তদাশ্রিতা লতাও যেমন পতিত হয়, স্বামীবিরহে আমারও তদ্রূপ অবশ্য পতন হইবে। হায়, আমার কি হইল ! হায়, আমি কোথা যাই, কি করি, কাহারই বা শরণাপন্ন হই ! অয়ি সর্ব্বভূতধাত্রী জননী ধরিত্রি ! আমারে তোমার কোমল ক্রোড়ে আশ্রয় দাও। অয়ি সর্ব্বভুবনপ্রকাশক ভগবন্ ভাস্কর ! আমারে খরকরে এই মুহূর্ত্তেই দগ্ধ করিয়া, লোক-

লোচনের বহির্ভূত কর। অয়ি সর্ব্বভূতজীবন ভগবন্ পবন! তুমি আর আমার প্রতি প্রবাহিত হইও না। হা তাত! তুমি কোথায়! তুমি যে আমায় প্রাণাধিক প্রীতিসহকারে পরম সমাদরে পালন ও সুখে থাকিব বলিয়া, সৎপাত্রে সমর্পণ করিয়াছিলে; কিন্তু আজি তোমার সকল আশা ও সকল মনোরথ বিফল হইল! স্বামী আমায় ত্যাগ করিয়াছেন; আমার সুখের পথ জন্মের মত রুদ্ধ হইয়াছে! তাত! তুমি পরলোকে কোথায় আছ? শুনিয়াছি, মৃত্যু হইলে, পুনরায় ইহলোকে জন্ম হইয়া থাকে। অতএব তুমি পরলোকে বা ইহলোকে যেখানেই থাক, একবার আসিয়া দেখিয়া যাও, আমার দুর্দ্দশার শেষদশা উপস্থিত হইয়াছে! আমি নির্দ্দয়া জননীর নাম করিব না। কেননা, তিনি জাতমাত্রেই আমারে ত্যাগ করিয়াছেন। হায়,আমি কি করি, কোথা যাই!

নাথ! জীবিতেশ্বর! একবার গাত্রোত্থান কর। আমি জন্মের মত তোমারে আলিঙ্গন করি। অয়ি রাজীবলোচন! এই যে আমায় প্রিয়বাক্যে সম্ভাষণ করিতেছিলে? ইতি মধ্যে আমার কি অপরাধ হইল, আর কথা কহিতেছ না? নাথ! কিজন্য মুদ্রিত নয়নে ধরাপৃষ্ঠে ধূলির উপরি শয়ন করিয়া রহিয়াছ? তুমি ত কখনও এরূপে শয়ন করিতে না। উঠ, উঠ; অতি কঠিন মৃত্তিকা স্পর্শে কোমল দেহের অনায়াসেই গুরুতর বেদনা হইবে। অয়ি জীবিতেশ্বর! ভগবান্ ভানুমান্ মধ্যগগনে অবতরণ করিয়াছেন। তোমার ভোজনবেলা উপস্থিত। ঐ দেখ, তোমার পোষিত

কুক্কুর সকল তোমার প্রসাদ অভিলাষে একে একে সমাগত হইতেছে। ইহারা আমা অপেক্ষাও তোমার প্রীতিপাত্র। অতএব উঠিয়া ইহাদিগকে স্বহস্তে আহার প্রদান কর। হায়, প্রাণেশ্বর প্রাণ পরিহার করিয়াছেন; আমি জীবিত রহিয়াছি! ইহা কি স্বপ্ন, না,মায়া,অথবা মোহ কিংবা অনাবিধ বিকার! রে হত দগ্ধ পাপ প্রাণ! তুমি এখনও এই স্বামীহীন অপবিত্র দেহে অবস্থিতি করিতেছ? যদি এই মুহূর্ত্তে ইহা পরিত্যাগ না কর, বলপূর্ব্বক তোমারে দূরীকৃত করিব। তোমার ঈশ্বর তোমারে ত্যাগ করিয়াছেন; তোমার আর মমতা কি? হায়, আমি আর এই পাপ পৃথিবীতে অবস্থিতি করিব না! স্বামীবিরহে ইহা এখন শ্মশানভূমি হইয়াছে! হায়, আমি কোথা যাই, কি করি! কে আমায় রক্ষা করিবে ও আশ্রয় দিবে! সর্ব্বথা আমি হত হইলাম, বিনষ্ট হইলাম, দগ্ধ হইলাম, অনাথা হইলাম! আমার কি হইবে!

ভগবন্! তৎকালে শোকে দুঃখে বিহ্বলা হইয়া,বিপদে সন্তাপে ব্যাকুলা হইয়া, এবং অসুখে অবসাদে আকুলা হইয়া, এই রূপেও অন্যরূপে কতরূপে বিলাপ ও পরিতাপ করিয়াছিলাম, সে সকল এখন স্মরণ হয় না। কোন দিকে কোনরূপ উপায় নাই, অভিভাবক নাই, আশা নাই, আশ্বাস নাই; এবং প্রবোধ বা সান্ত্বনা ও দিবার কেহ নাই। ইদৃশী অবস্থায় মাদৃশী ক্ষুদ্রপ্রাণা ক্ষুদ্রবুদ্ধি অবলার যে অতি ক্ষুদ্র মন যতদূর বিহ্বল ও ব্যাকুল হইবার সম্ভাবনা; আমারও তাহার অধিক হইয়াছিল। স্বামী ও শ্বশ্রূ উভয়ের তাদৃশ

অতিদারুণ অপমৃত্যুই ইহার কারণ। উভয়েই রক্তাক্ত-কলেবরে ধরাতলে পতিত। লোকে হঠাই দেখিলে, মনে করিতে পারে, আমিই তাঁহাদিগকে হত্যা করিয়াছি।

তৎকালে এইপ্রকার চিন্তা করিয়া, আমার মন আরও বিহ্বল হইয়া উঠিল এবং তৎসহকারে সহসা এই প্রকার ভাবনার সঞ্চার হইল যে, মরিবার এই উপযুক্ত শুভ সময় উপস্থিত। কোন মতেই ইহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। আমারও আর কোন দিকে কোনরূপ বন্ধন নাই এবং তজ্জন্য জীবন ধারণেরও আর কোন প্রকার আবশ্যকতা নাই। বিশেষতঃ, আমি বাঁচিয়া থাকিলে, পৃথিবীরই বা উপকার কি? সৃষ্টিরই বা সার্থকতা কি? এবং লোক-সকলেরই বা ইষ্টাপত্তি কি? তবে আমি কিজন্য ঈদৃশ নিষ্প্রয়োজন ও নিঃস্বত্ব জীবন ধারণ করিব? ইহা ধারণ করিলে, পুনশ্চ, আমার নিজেরই বা উপকার কি? যাহা কিছু উপকারের প্রত্যাশা বা সম্ভাবনা ছিল, পিতা, মাতা অবশেষে ভর্ত্তা ত্যাগ করাতে, তাহা একবারেই দূর হইয়াছে। অতএব এই মুহূর্ত্তেই অনর্থক এই দেহভার পরিহার করিয়া সকল ভারের লাঘব করিব।

ভগবন্! ব্যাকুল ও বিহ্বল হৃদয়ে এই প্রকার চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে ঘনঘোর গভীর অন্ধকারে সহসা যেন আমার চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন হইল; আলোকে প্রসার রুদ্ধ হইল; দৃষ্টিশক্তি প্রতিহত হইলে, আমি আকাশে কি পাতালে, কি পৃথিবীতে,কিছুই বুঝিতে পারিলাম না। পরক্ষণেই এইপ্রকার বোধ হইল,যেন অন্ধকারময় গভীর গর্ত্তে বলপূর্ব্বক নীয়মান

হইতেছি। ঐ সময়ে স্নেহময়ী জননী যেন সেই অন্ধকার মধ্যে আচ্ছন্ন বেশে সহসা অবতরণ করিয়া,মৃদুস্বরে কহিতে লাগিলেন, অয়ি হতভাগিনি! আত্মঘাতিনী হইও না। ইহজন্মের এই ফল। পরজন্মে যদি সুখিনী হইবার অভিলাষ থাকে, তাহা হইলে, আত্মহত্যা করিয়া, স্বহস্তে তাহার পথ রুদ্ধ করিও না। আত্মঘাতীর পরলোক নাই; আমি চলিলাম। তুমি সুখে থাক এবং যদি স্বপথে ও স্বভাবে থাকিতে পার, তাহা হইলে, পরলোকে পুনরায় উভয়ের দর্শন হইবে। এই বলিয়াই, তিনি যেন চপলাগমনে তৎক্ষণে অন্তর্হিত হইলেন।

আমি কষাহত অশ্বের ন্যায়, পরক্ষণেই চকিত হইয়া উঠিলাম এবং জননী জননী বলিয়া, তাঁহাকে আলিঙ্গন করিতে উদ্যত হইলাম। কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হইতে পারিলাম না। তখন আমার ঘোরভাব দূর হইল। চেতনার সমাগমে পুনরায় ইতস্ততঃ চকিত চঞ্চল বিহ্বলদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া, মৃতপতিত প্রিয়তমের পদযুগল ধারণপূর্ব্বক বিলাপ করিতে লাগিলাম, নাথ! দাসী আমি, অনুগতা আমি চরণে ধরিয়া বারংবার বিলাপ করিতেছি, একবার প্রসন্ননয়নে নিরীক্ষণ করিয়া, আমারে আশ্বস্ত কর। আমার আর উপায় কি, অবলম্বন কি? পিতা মাতা এই হতভাগিনীকে ত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। এখন তুমি ত্যাগ করিলে আমি আর কাহার শরণাপন্না হইব! নাথ! উঠ, উঠ। আমি তোমার জন্য স্বয়ং যমভবনে গমন করিয়া, ধর্ম্মরাজের নিকট এই বলিয়া প্রার্থনা করিব, অয়ি ধর্ম্মরাজ! তুমি সক-

লের অন্তর্যামী। তোমার অবিদিত কিছুই নাই। আমি সর্ব্বথা নিরপরাধিনী। অতএব আমার স্বামীকে গ্রহণ করিও না। যদি একান্তই গ্রহণ করিবে, আমাকেও সঙ্গে লও। আমি পিতৃহীন ও মাতৃহীন হইয়াছি। স্বামীহীন হইয়া, কোনমতেই জীবন ধারণে সমর্থ হইব না। নাথ! উঠ, উঠ। আমি অতিমাত্র ব্যাকুলা ও বিহ্বলা হইয়াছি এবং নানাপ্রকার বিভীষিকা দর্শন করিয়া আমার প্রাণ কণ্ঠাগত হইয়াছে। উঠিয়া আমাকে আশ্বাস প্রদান কর। হায়, আমার কি হইল! হায়, আমি হত হইলাম ও বিনষ্ট হইলাম! হা কি দুর্দ্দৈব! হা কি দুরদৃষ্ট! স্বামী আমার সম্মুখে পতিত রহিয়াছেন। ইহা দেখিয়াও হতভাগিনী আমি জীবিত রহিয়াছি। হায়, আমার কেহ নাই; এসময় আসিয়া, আশ্বাস প্রদান করে!

এই প্রকার বিলাপ করিতে করিতে স্বামীর মস্তক ক্রোড়দেশে ন্যস্ত করিয়া, গলদশ্রু লোচনে গদ্‌গদ বচনে বলিতে লাগিলাম, নাথ! তুমি পরম পবিত্র দিব্যলোকে গমন করিতেছ। এ সময় পাপিনী আমি স্পর্শ করিয়া তোমায় অপবিত্র করিব না। তথাপি, জন্মের মত একবার আলিঙ্গন করিয়া, আত্মাকে শীতল ও সার্থক করি। আর তোমায় ইহলোকে দেখিতে পাইব না। অথবা, এই পাপলোকে তোমার ন্যায়, পরম পবিত্রস্বভাব মহাপুরুষের বাস করা উচিত হয় না। অতএব তুমি সুখসচ্ছন্দে দিব্যধামে গমন কর। এবং সেখানে যাইয়া শান্তিসুখ সম্ভোগ কর। তুমি যেরূপ সৎস্বভাব ও স্বধর্ম্মনিরত, তাহাতে, পরলোকে

কখনই অসুখী হইবে না।. হতভাগিনী আমার কি হইবে ! আমি তোমা ব্যতিরেকে এই পাপলোকে কিরূপে পাপপ্রাণ ধারণ করিব ! অথবা, আর আমি তোমায় কোন কথা বলিব না। স্বামীর উপরি স্ত্রীর প্রভুত্ব কি ? অতএব তুমি সুখে গমন কর ; পথিমধ্যে যেন তোমার কোনরূপ বিঘ্ন না হয়। আমি কায়মনে ছত্রিশকোটি দেবতারে প্রণাম পূর্ব্বক প্রার্থনা করিতেছি, তুমি যেখানে থাকিবে, সেখানে যেন নিত্য সুখ-শান্তি বিরাজ করে। এবং কোনপ্রকার উদ্বেগ ও অসুখ যেন তাহার ত্রিসীমায় যাইতে না পারে। নাথ ! তুমি ইহ-লোকে অনেক ক্লেশ ভোগ করিয়াছ। পরলোকে গিয়া সে সকলের একবারেই শান্তি হউক। তুমি যে পথে গমন করিবে, সে পথে যেন অনবরত পুষ্পবৃষ্টি হয় ; দিবাকর যেন স্নিগ্ধকিরণ বিকিরণ করেন ; চন্দন গন্ধবাহী সুগন্ধি গন্ধবহ যেন মৃদুমন্দ প্রবাহিত হয় ; এবং তোমার যেন যমভবন দর্শন না হয়। তুমি কখনও কাহার কোনরূপ অপকার কর নাই। সেই পুণ্যবলে পরলোকে পরম স্থান প্রাপ্ত হও। পরোপকারপরায়ণ পুরুষগণের যে গতি, তোমার যেন সেই গতি লাভ হয়। পরমার্থনিষ্ঠ তাপসগণের যে গতি, তোমার যেন সেই গতি লাভ হয়। সংগ্রামবিজয়ী বীরগণের যে গতি, তোমারও যেন সেই গতি লাভ হয়। সরল ও সমদর্শীগণের যে গতি, তোমার যেন সেই গতি লাভ হয়। তুমি যেমন অসুখে ছিলে, এখন যেন সেইরূপ সুখে থাক। আমি নিজের সমুদায় পুণ্য তোমারে প্রদান করিলাম। এবং তাহার সহিত মন, প্রাণ, আত্মাও সমর্পণ

করিলাম। এই সকল তোমার পাথেয় হইবে, তুমি সুখে গমন কর। ইন্দ্রাদি অষ্টলোকপাল তোমার অষ্টদিক্ রক্ষা করুন ; ধর্ম্ম ও সত্য তোমার মস্তক ও পৃষ্ঠদেশ রক্ষা করুন। এবং ধাতা ও বিধাতা উভয়ে তোমার উভয় পার্শ্ব রক্ষা করুন। নির্ব্বিঘ্নে গমন কর এবং যেখানে সত্যবান্ ও সাবিত্রী, নল ও দময়ন্তী, রাম ও জানকী এবং অগস্ত্য ও লোপামুদ্রা বিরাজ করিতেছেন, সেই স্থানে অবস্থান পূর্ব্বক সুখী হও।

বলিতে বলিতে দুর্নিবার মূর্চ্ছাবেগে ধরাতলে পতিত হইলাম। কতক্ষণ পড়িয়াছিলাম, তাহা মনে হয় না। উঠিয়া দেখি, সর্ব্বশরীর বেদনায় আচ্ছন্ন ; চতুর্দ্দিক্ লোকারণ্য এবং দর্শকমাত্রেই বিস্ময়াপন্ন ও মলিনভাবসম্পন্ন। কেহ আমার স্বামীর জন্য ও কেহ বা শ্বশ্রূর নিমিত্ত শোক করিতেছে এবং সকলেই পাপীয়সী ও কুলনাশিনী বলিয়া, আমায় নিন্দা করিতেছে। যাহারা আমার আত্মপক্ষ, তাহারাও যেন মহা বিপক্ষ হইয়াছে। অথবা, বিপদ্ উপস্থিত হইলে, অমৃতও বিষ হইয়া থাকে। ইহারই নাম সংসারের অসারতা। আমি ঐ অসারতা তখনই বুঝিতে পারিলাম। শোকে ও দুঃখে মন অতিমাত্র বিহ্বল ও অভিভূত ছিল। এইজন্য তাহাতে ভ্রূক্ষেপ হইল না। আপনার দুরদৃষ্টেরই মনে মনে নিন্দা করিয়া, শূন্যনয়নে শুষ্কবদনে উপবেশন করিলাম। সুখের কি দুঃখের দশা, উন্মাদের কি প্রকৃতির অবস্থা, মানুষ কি পশু, আমরা জড় কি জীবিত, তাহার স্থিরতা নাই। এইপ্রকার অবস্থায় বাঙ্-

নিষ্পত্তিবিরহিত হইয়া, উপবেশন করিলাম।

ভগবন্! তখনও প্রাণনাথের মুখকান্তি মলিন হয় নাই। তখনও নয়নযুগলের নির্ব্বাণভাব উপস্থিত হয় নাই। তখনও অধরোষ্ঠের প্রতিভা পতন হয় নাই। তখনও কপোলতলের রাগ ভ্রষ্ট হয় নাই। নিশাশেষে নিশাকর অতি নিম্নে পতিত হইলেও, তাহার সেই নির্ব্বাণোন্মুখ আলোকরেখা যেমন অল্প অল্প লক্ষিত হয়, তখনও তাঁহার সেই মৃতদেহ তদ্রূপ ঈষদীষৎ কান্তিরেখা যেন ইতস্ততঃ সঞ্চরমান হইতেছিল। আমি একমনে ও একনয়নে তাহাই দেখিতে লাগিলাম এবং শরীরে যে ধূলা ও তৃণ প্রভৃতি সংলগ্নমাণ ও মাক্ষিকাদি পতমান হইতেছিল; ধীরে ধীরে বস্ত্রাঞ্চল দ্বারা তাহা অপসারণ ও মার্জ্জন করিতে লাগিলাম। মনে হইল, তিনি যেন মধুপানে মত্ত হইয়া, অথবা মৃগয়া পরিশ্রমে অবসন্ন হইয়া, কিংবা আহারান্তে অভ্যাসের বশবর্ত্তী হইয়া, জননীর পার্শ্বদেশে শয়ন করিয়া আছেন। এখনই উত্থান করিবেন। যদি স্বয়ং উত্থান না করেন, তাহা হইলে, আমিই বলপূর্ব্বক উত্থান করাইব। কেননা, তাঁহার ভোজনবেলা অতীতপ্রায় এবং বৈকালিক ব্যায়ামবেলাও উপস্থিতপ্রায়। অন্যদিন এইরূপ ঘটিলে, জননী তাঁহাকে উঠাইয়া থাকেন। কিন্তু তিনি পার্শ্বদেশে মৃতপতিত রহিয়াছেন। অতএব আমি ভিন্ন আর কে উত্থান করাইবে।

ভগবন্! যদিও অনেক দিনের কথা, সমুদায় সবিশেষ মনে নাই; কিন্তু প্রিয়তমের সেই দিব্য মোহন সুন্দর মূর্ত্তি, সেই প্রণয়লাঞ্ছিত প্রীতিময় সুস্নিগ্ধ ছবি অজিও আমার

নয়ন মনের অণুমাত্রও অন্তর্হিত হয় নাই। উহা আমার প্রাণের অভ্যন্তরে,শিরে শিরে,পঞ্জরে পঞ্জরে,ফলতঃ প্রত্যেক শোণিত বিন্দুতে যেন লিপ্ত, মিলিত ও নিহিত রহিয়াছে। আমি যখন তখন যে সে অবস্থায় তাহা প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া থাকি। শয়নে, স্বপ্নে, জাগরণে, কিছুতেই উহা আমার অন্তর হইতে অন্তর্হিত হয় না। এই আমি আপনার সহিত কথা কহিতেছি, আর উহা যেন আমার অন্তর্গৃহে সেইরূপে মূর্ত্তিমান ও জাগরিত হইয়া আমার দর্শনগোচরেও যেন নৃত্য করিতেছে। যে দিন বা যে মূহূর্ত্তে আমার অন্তর ও নয়ন হইতে উহা অন্তর্হিত হইবে,সেই দিন বা সেই মুহূর্ত্ত আমার জীবনের অবসান হইয়াছে, জানিবেন। আমি যে অশেষ ক্লেশ স্বীকার করিয়া তপশ্চরণ করিতেছি, পরলোকে স্বামীর সহিত মিলিত হওয়াই তাহার একমাত্র উদ্দেশ্য। সাক্ষাৎ মুক্তিলাভ আমার অভিপ্রেত নহে। আমি জানি ও হৃদয়ের সহিত বিশ্বাসও করি যে,স্বামিসহবাসই সাক্ষাৎ স্বর্গ ও অপবর্গ। ভগবতী মহামায়া বলিয়াছেন, অনতি-চিরকাল মধ্যেই আমার স্বামীলোক লাভ হইবে। আমি সশরীরেই সেই দিব্যধামে গমন করিব। ভগবন্! সে দিন কি সুখের দিন এবং সে মুহূর্ত্তও কি সুখের মুহূর্ত্ত। যে দিন যে মুহূর্ত্তে আমি সেই দিব্যলোকে আমার সেই প্রত্যক্ষ দেবতার সহিত সংমিলিত হইব। আমি কেবল এই আশয়ে ও এই আশ্বাসেই কথঞ্চিৎ প্রাণধারণ করিতেছি। নতুবা, এতদিন যে কোনরূপে কলেবর পাত করিতাম। দেবীর প্রসাদে জ্ঞান, বিজ্ঞান ও যোগাদি সকল বিষয়েই আমার

সম্পূর্ণ সিদ্ধিলাভ হইয়াছে। এক্ষণে স্বামিসিদ্ধিসম্পন্ন হই-লেই, সর্ব্বথা কৃতমনোরথ হইব।

বলিতে বলিতে তাঁহার শোক যেন নবীভূত হইয়া উঠিল। তিনি ঈষৎ ব্যাকুলিতার ন্যায় হইলেন। অনন্তর দিব্যজ্ঞানবলে আপতিত মনোবোধ সংবরণ ও আত্মাকে প্রকৃতিস্থ করিয়া, পুনরায় বীণার ন্যায় মধুরস্বরে ধীরে ধীরে বলিতে লাগিলেন, ভগবন্! তখন চৈত্রমাস। বেলা দ্বিতীয় প্রহর অতীতপ্রায়, চতুর্দ্দিক নিস্তব্ধ, কোনদিকে কোন-রূপ শব্দ নাই। বোধ হয়, এই শোচনীয় ঘটনা দর্শন করিয়া, সমুদায় সংসার যেন নীরব হইয়াছে, ক্ষুদ্র দুর্ব্বল চাতকই কেবল একান্ত অসহমান হইয়া মধ্যে মধ্যে আমার ন্যায়, চীৎকার করিতেছে। ভগবন্ ভাস্কর মধ্যগগনে অবতারণ করিয়াছেন। তাঁহার মূর্ত্তি প্রজ্বলিত পাবকপ্রায়। দেখিলে স্পষ্টই বোধ হয়, তিনি যেন এই অন্যায় দর্শনে অতিমাত্র কুপিত হইয়াছেন। দিক সকলও যেন আমার দুঃখে ঘোরায়িত হইয়া উঠিয়াছে। সমীরণও যেন আমার শোকে সন্তপ্ত হইয়াই, মৃদুমন্দ প্রবাহিত হইতেছে। বৃক্ষের পত্রসকলও যেন আমার সন্তাপে ম্লান হইয়া গিয়াছে। ফলতঃ, সমস্ত সংসারই যেন এই ভয়াবহ দুর্ঘটনায় বিষাদিত ও মলিন হইয়াছে। জীবিতেশ্বর আমার সম্মুখে ঈদৃশ ঘোর মুহূর্ত্তে পতিত রহিয়াছেন। তাঁহার তখন পূর্ণ যৌবন, শরীর যেরূপ আয়ত, সেইরূপ উন্নত। বোধ হইল, যেন সুবিশাল সালতরু বিষম ঝটিকাবেগে ধরাসাৎ হইয়াছে। অথবা, মৃগরাজ যেন গজরাজকে নিপাতিত করিয়াছে।

কিম্বা আমারই সৌভাগ্যরাশি যেন তাদৃশ শোচনীয় বেশে সাক্ষাৎ স্খলিত ও বিগলিত হইয়া পড়িয়াছে। অথবা, হতভাগিনী আমি যে পাপ করিয়াছি, তাহারই মূর্ত্তিমান্ বিপরিণাম যেন ঐরূপে সংঘটিত হইয়াছে। কি করিব, কি হইবে, ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। উপায় কি, ব্যবস্থা কি, তাহারও কোনরূপ নির্ণয় হইল না। শূন্য-হৃদয়ার ন্যায়, হতচিত্তার ন্যায়, এবং উন্মাদিনীর ন্যায়, কেবল বসিয়া রহিলাম। অনর্গলবিনির্গলিত নয়নসলিলে বক্ষ-স্থল ভাসিয়া যাইতে লাগিল। ইত্যবসরে কতিপয় উগ্র-মূর্ত্তি উগ্রপ্রকৃতি রাজপুরুষ সহসা তথায় উপস্থিত হইল, তাঁহাদের তৎকালীন ভীষণ আকার আজিও আমার চিত্ত-পটে অঙ্কিত রহিয়াছে। তাহাদের মধ্যে অন্যতর কহিল, রাজার আদেশ আছে, সহজে না যাইলে, বলপূর্ব্বক বন্ধন করিয়া, লইয়া যাইব। আমি নিতান্ত নিরুপায় ভাবিয়া গলদশ্রু লোচনে গদ্গদ বচনে কহিলাম, আমার অপরাধ কি? তাহারা কহিল, জানি না। এবং জানিবারও কোন আবশ্যকতা নাই। তোমাকে এই মুহূর্ত্তেই যাইতে হইবে। আমি কহিলাম, আমার স্বামী ও শ্বশুর কি হইবে? তাহারা কহিল, তাহাও আমরা জানি না। অতএব আর অনর্থক বাক্যব্যয় না করিয়া, উত্থান কর। নতুবা, পশুর ন্যায়, বন্ধন করিব। এই কথায় আমি শূন্যহৃদয়ে ও শুষ্কমুখে চতুর্দ্দিক্ নিরীক্ষণ করিয়া, গাত্র হইতে সমুদায় অলঙ্কার উন্মোচন পূর্ব্বক তাহাদের হস্তে ন্যস্ত করিলাম। ভাবিলাম, স্বামীই স্ত্রীলোকের অলঙ্কার। তিনিই যখন ত্যাগ করিলেন, তখন

আর এই সামান্য অলঙ্কারে প্রয়োজন কি ? অতএব ঐই দুরাচার পাষণ্ডদিগকে প্রদান করিয়া, কথঞ্চিৎ শান্ত করি। বাস্তবিক, তাহাই হইল। তাহারা অলঙ্কার পাইয়া, শান্ত-বাক্যে কহিল, ভদ্রে! তোমার কোন চিন্তা নাই। আমরা তোমাকে স্পর্শ করিব না। তুমি নির্ব্বিশঙ্ক চিত্তে অগ্রে অগ্রে গমন কর! যাহাতে রাজদ্বারে অব্যাহতি পাও, তাহারও চেষ্টা করিব। আর, আমাদের মধ্যে একজন তোমার স্বামী ও শ্বশ্রূর রক্ষণাবেক্ষণ করিবে।

এই কথায় আমি অনিচ্ছা থাকিলেও, অগত্যা অতিকষ্টে উত্থিত হইলাম। এবং গলদশ্রু লোচনে গদ্গদ বচনে মৃত পতিকে জীবিতের ন্যায়, সম্বোধন করিয়া কহিলাম, নাথ! এই চন্দ্র সূর্য্য সাক্ষী, আমি ইচ্ছা করিয়া তোমাকে পরিত্যাগ করিতেছি না। তুমি প্রতিদিন ভক্তিভরে যাঁহা-দের উপাসনা করিতে, সেই দেবতারা এখন তোমারে রক্ষা করুন। আমার ন্যায়, তাঁহাদের রাজদণ্ডভয় নাই। 'অথবা যে বিধাতা তোমারে সৃষ্টি করিয়াছেন এবং এতদিন রক্ষা করিয়া আসিয়াছেন, আমি ত্যাগ করিলে, তিনি কখনই তোমার আত্মাকে ত্যাগ করিবেন না। মানুষের ক্ষমতা কি? সে কেবল বিপদের সময় ক্রন্দন ও সম্পদের সময় হর্ষ প্রকাশ করিতে জানে।

এই বলিয়া আমি নেত্রবারিমোচনপূর্ব্বক ধীরে ধীরে উন্মাদিনীর ন্যায়, গমন করিতে লাগিলাম। নিকটেই ধর্ম্মাধিকরণ। অনতিবিলম্বেই তথায় উপস্থিত হইলাম। প্রাড়্বিবাক যেন আমারই অপেক্ষায় বসিয়াছিলেন।

যাইবামাত্র কোন কথা জিজ্ঞাসা না করিয়া, এইমাত্র কহিলেন, অয়ি শবরি! আমি পূর্ব্বেই চরমুখে সমস্ত সবিশেষ শ্রবণ করিয়াছি। তুমি যে অপরাধ করিয়াছ, তাহাতে, তোমার নির্ব্বাসন দণ্ডই সমুচিত প্রায়শ্চিত্ত। অতএব তুমি এই মুহূর্ত্তেই এই রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাও। আমি কোন উত্তর না করিয়া, স্থির হইয়া, দাঁড়াইয়া রহিলাম। তদ্দর্শনে তিনি কহিলেন, তোমার বক্তব্য কি? আমি কহিলাম, আমাকে হত্যা করুন। না হয়, স্বামীর সহমৃতা হইতে অনুমতি করুন। তিনি কহিলেন, ব্যভিচারিণী, বিশেষতঃ স্বামিঘাতিনীর আবার সহমরণ কি? আমি কহিলাম, ধর্ম্মাবতার, আমি সর্ব্বথা নিরপরাধিনী। তিনি কহিলেন, প্রমাণ কি? আমি কহিলাম, প্রমাণ আমার অন্তরাত্মা এবং সাক্ষী ঐ দিনরাত্রিপ্রতিষ্ঠাতা সূর্য্যচন্দ্র। তিনি কহিলেন, অপরাধী মাত্রেই এইরূপ বলিয়া থাকে। আমি কহিলাম, যাহার কেহ নাই, ভগবানই তাহার সহায়। আমি ইহলোকে যদিও নিজের বুদ্ধিদোষে আশ্রয় পাইলাম না, কিন্তু পরলোকে অবশ্যই আমার আবার সদ্‌বিচার হইবে। সেখানে রাজা প্রজা সকলেই সমান এবং একমাত্র সত্যেরই জয় হইয়া থাকে। ঘৃণা, লজ্জা, শোক, মোহ, এই সকলে আমার বুদ্ধিশুদ্ধিলোপ হইয়াছিল। কি বলিলে ও কি করিলে, ভাল হয়, তাহার কোনই জ্ঞান ছিল না। এই কারণে ঐরূপ বাগ্‌বিন্যাস করিয়াই, বিনিবৃত্ত ও অধোবদনে দণ্ডায়মান হইয়া, অন্যমনস্কার ন্যায় ভূমি বিলিখন করিতে লাগিলাম। প্রাড়্‌বিবাক

কহিলেন, যাহাই হউক, নির্ব্বাসন ভিন্ন তোমার আর কোন-রূপ দণ্ড সমুচিত নহে।

এই বলিয়া তিনি সম্মুখচর দণ্ডরক্ষীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে, সে তদ্দণ্ডে যমদণ্ডের ন্যায়, দণ্ডায়মান হইয়া, আমারে ধর্ম্মাধিকরণের বহিষ্কৃত ও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিল। সৌভাগ্যক্রমে আমি এই কৈলাসাচলের সন্নিহিত সুপ্রসিদ্ধ তাপসারণ্যে নীত হইলাম। এখানে কোন ঋষি দিব্য জ্ঞান-বলে সমুদায় ঘটনা সবিশেষ অবগত ও করুণাপ্রণোদিত হইয়া, আমারে কহিলেন, কল্যাণি! তুমি যে আত্মঘাতিনী হও নাই, ইহা নিরতি সোভাগ্যের বিষয়। আমি জ্ঞানবলে দেখিতেছি, তোমার অচিরাৎ স্বামীলোক লাভ হইবে। তথায় তুমি নির্ব্বাণ সুখ ভোগ করিবে। এই কথায় আমি আশ্বস্ত ও প্রকৃতিস্থ হইরা, স্ত্রীজাতিসুলভ করুণা ও মোহ-বশতঃ ক্রন্দন করিতে লাগিলাম। তিনি আমায় সর্ব্বথা নিরপরাধিনী জানিয়াছিলেন। এইজন্য পুনরায় সান্ত্বনা করিয়া কহিলেন, ভদ্রে! তোমার ভাবনা নাই। আমি তোমায় দীক্ষিতা করিব। তুমি দীক্ষান্তে ভগবতী পার্ব্বতীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হও। অচিরকালমধ্যেই সিদ্ধি লাভ করিবে। তপস্যার অসাধ্য কিছুই নাই। এই বলিয়া তিনি দীক্ষা প্রদান করিলে, আমি সর্ব্বতোভাবে শুদ্ধসত্ত্বা হইয়া, শক্তিসাধন তপশ্চরণে প্রবৃত্ত ও ঋষির প্রসাদে অচিরাৎ কৃতমনোরথ হইলাম। আমি যে অধুনাদেবীর পরিবার মধ্যে পরিগণিত হইয়াছি, ইহা সেই তপস্যারই শুভ পরিণাম।

ভগবন্! হতভাগিনী আমার এই নিরবচ্ছিন্ন শোকদুঃখ-সন্তাপময়ী জন্মবিবৃতি। ইহা শুনিলে,যুগপৎ ঘৃণা ও জুগুপ্সার উদয় হয়; মনুষ্যজীবনে ও মর্ত্ত্যলোকে পরিহার-প্রবৃত্তির সঞ্চার হয় এবং লোকালয়ে ও লোক সকলকে শত ধিক্কার প্রদান করিতে অভিলাষ হয়। অতএব আর পাপ কথায় আবশ্যক নাই। অধুনা, আমাকে আপনার কি করিতে হইবে, আজ্ঞা করিয়া, অনুগৃহীত করুন।

সপ্তদশ পটল

কর্ত্তব্য নিরূপণ।

অগস্ত্য কহিলেন, কল্যাণি! তোমার এই ইতিবৃত্ত শ্রবণ করিলে, সাংসারিক বিষয়ে অনেক শিক্ষালাভ হয়। আমি শুনিয়া, পরমপ্রীতি লাভ করিলাম। অন্তরা আমার অতি-মাত্র দুঃখও উপস্থিত হইয়াছে। কেন না, তোমাকে অতীত ঘটনার স্মরণ নিবন্ধন অনর্থক দুঃখিত করিলাম। যাহা হউক, অধুনা,আমার অভিপ্রেত বর্ণন করিতেছি, যথাযথ উত্তরদানে আমারে আপ্যায়িত কর। সংসারে মানুষের কর্ত্তব্য কি, এ বিষয়ে আমার দারুণ সংশয় আছে।

উলূপী কহিলেন, ভগবন্! মানুষেরকর্ত্তব্য তিনপ্রকার। তন্মধ্যে চরাচর বিধাতা পরম পুরুষ পরমেশ্বরকে ভক্তি করা, প্রীতি করা ও উপাসনা করা প্রথম কর্ত্তা। ঈশ্বরভক্তির অব্যাঘাতে আপনার উন্নতি করা দ্বিতীয় কর্ত্তব্য এবং আত্ম-

ব্যতিরিক্ত প্রাণীমাত্রে দয়া ও মৈত্রী প্রদর্শন করা তৃতীয় কর্ত্তব্য। যাহাতে এই ত্রিবিধ কর্ত্তব্য প্রতিপালিত হয়, তদ্বিষয়ে স্বতঃ পরতঃ যত্নবান্ হইবে। কোনরূপে ইহার কোনরূপ ব্যভিচার করিবে না। কর্ত্তব্যপরায়ণ ব্যক্তি-মাত্রেই অক্ষয়স্বর্গ লাভ করে, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই।

অগস্ত্য কহিলেন, বাল্যকালের কর্ত্তব্য কি?

উলূপী কহিলেন, যাহাতে উত্তরকাল সুখে অতিবাহিত হইতে পারে, এরূপ শিক্ষা করাই বাল্যকালের কর্ত্তব্য। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যেরূপ গ্রীষ্মের আতিশয্য হইলে, বৃষ্টির আসন্নতরবর্ত্তিতার অনুমান হয়, তদ্রূপ বাল্যকাল ভাল হইলে, উত্তরকাল ভাল হইবে, এরূপ নির্ণয় করিতে পারা যায়।

অগস্ত্য কহিলেন, যুবার কর্ত্তব্য কি?

উলূপী কহিলেন, ভগবন্! যুবার প্রধান কর্ত্তব্য, অনাসক্ত হইয়া বিষয় সেবা করা। কেননা, বিষয়ের প্রলোভন অতি ভয়াবহ ও অতীব দুরতিক্রম্য। হস্তী যেমন পঙ্কমধ্যে পতিত হইলে, ক্রমেই অবসন্ন হয়, বিষয়ে আসক্তি হইলে, তদ্রূপ অবসাদ উপস্থিত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ, বিষয়-সেবা আত্মার মূর্ত্তিমান্ গ্লানি। কেননা, বিষয় ও পরমার্থ এই উভয়ে বহুল অন্তর। পণ্ডিতেরা শতরূপে বিষয়ের দোষ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তন্মধ্যে অন্ধতা, মত্ততা, প্রমত্ততা উন্মত্ততা, অতিক্রান্ততা, ব্যভিচারিতা, লঘুতা, স্থিতিরোধ-কতা, ব্যাপকতা, মহানষ্টতা, স্তব্ধতা, অতিপাতিতা বিহ্ব-

লতা, দুরাচারিতা, হৃদযশূন্যতা, অসমীক্ষ্যকারিতা, পূর্ব্বাপর-বিরোধিতা, পরলোকভ্রষ্টতা, জঘন্যতা, প্রধৃষ্যতা ও বিপ্রকারিতা এই কয়টী প্রধান।

অগস্ত্য কহিলেন, কল্যাণি! একে একে ইহাদের অর্থ ও প্রয়োগস্থল নির্দ্দেশ কর।—

উলূপী কহিলেন, ভগবন্! সংক্ষেপে শ্রবণ করুন। যে ব্যক্তি দেখিতে না পায়, তাহাকে অন্ধ বলে। বিষয়ে অতিমাত্র আসক্ত হইলে, লোকে আপনার স্বার্থ ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না; সুতরাং বিষয়ী অপেক্ষা অন্ধ আর কে আছে? মহারাজ বৃহদশ্ব এইরূপ অন্ধ ছিলেন। বিষয়ে সুরার অংশ আছে। সুরা সেবন করিলে, যেরূপ মত্ততা উপস্থিত হয়, বিষয়রস পান করিলেও, তদ্রূপ মত্ত হইয়া থাকে। যাহার হিতাহিত জ্ঞান নাই, তাহাকেই উন্মত্ত বলে। বিষয়ীমাত্রেই হিতাহিতজ্ঞানপরিশূন্য। ইহার শত শত দৃষ্টান্তের অভাব নাই। যে ব্যক্তি আত্মবিস্মৃত, তাহাকেই প্রমত্ত বলে। বিষয়ী অপেক্ষা আত্মবিস্মৃত আর কে আছে? যাহাতে আত্মা অধোগত হয়, তাদৃশ অপকর্ম্মেই তাহার প্রবৃত্তি শতমুখে ধাবমান হইয়া থাকে। পর্ব্বত প্রভৃতি দুরারোহ বলিয়া কেহ তাহাকে লঙ্ঘন করিতে পারে না। এইরূপ, যেখানে উচ্চতা, সেইখানেই অনতিক্রম বা অনতিভাব এবং যেখানে নীচতা, সেই খানেই অতিক্রম বা অভিভাব। যে ব্যক্তি সামান্য উদরান্নের জন্য দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করে, অথবা অন্যবিধ অতি কুৎসিত জঘন্য উপায়ের অনুসারী হয়, লোকমাত্রেই তাহাকে অতিক্রম করিয়া

থাকে। কাহারই নিকট তাহার সমাদর বা পরিগ্রহ নাই। ইহারই নাম অতিক্রান্ততা। এইরূপ অন্যান্ত স্থলে বুঝিয়া লউন।

অগস্ত্য কহিলেন, ভদ্রে! তোমার এই সরস-গর্ভিত বাগ্‌বিন্যাসে পরম আপ্যায়িত হইলাম। অধুনা, বৃদ্ধকালের কর্ত্তব্য কি, বর্ণন কর।

উলূপী কহিলেন, ভগবন্! বৃদ্ধকালের কর্ত্তব্য, একমাত্র ভগবৎসেবা, ইহা প্রতিপাদন করা বাহুল্য। ইহা স্থির নিশ্চয়, এই কলেবর অবশ্যই পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহা, স্থির নিশ্চয়; শরীরের সহিত স্ত্রীপুত্রাদি যাবতীয় বস্তুও পরিত্যাগ করিতে হইবে। ইহাও স্থির নিশ্চয়; আমার পিতা, পিতামহ ও অন্যান্য পুরুষেরা সকলেই যখন ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন, তখন আমাকেও অবশ্যই ত্যাগ করিতে হইবে। তবে আর সংসারে,শরীরে ও পুত্রাদিতে মমতা কি, আগ্রহ কি ও অনুরাগ কি? ইত্যাদি পর্য্যালোচনা করিয়া, ঐ সকলের একমাত্র ঈশ্বর ও প্রেরুয়িতা সেই জগৎপাতার শরণাপন্ন হওয়া বৃদ্ধের অবশ্য কর্ত্তব্য।

অষ্টাদশ পটল।

যোগস্বরূপ নির্ণয়।

অগস্ত্য কহিলেন, যোগশব্দের অর্থ কি ?

উলূপী কহিলেন, যোগশব্দের প্রকৃত অর্থ সত্বশুদ্ধি। কাম, ক্রোধ ও অহংকারাদি কষায় বা মলরাশির পরিহার হইয়া, আত্মার যে পবিত্রতা সমুদ্ভাবিত করে, তাহার নাম সত্বশুদ্ধি। নির্ম্মল দর্পণে যেরূপ অনায়াসেই মুখচ্ছবি প্রতিফলিত ও লক্ষিত হয়, আত্মা নির্ম্মল হইলে, তদ্রূপ তাহাতে ভগবৎস্বরূপ প্রতিবিম্বিত ও দৃষ্টির বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। যাহারা আত্মশুদ্ধি না করিয়া, শুদ্ধ পূরক ও কুম্ভকাদি সহায়ে ভগবৎসাধনে প্রবৃত্ত হয়, তাহারা কোন কালেই সিদ্ধিলাভে সমর্থ হয় না। এইরূপ ব্যক্তি-দিগকে হঠযোগী বলে।

জল যেরূপ জলের সহিত মিলিত হইলে, এক হইয়া যায়, তদ্রূপ স্বত্বশুদ্ধি হইলে, ভগবানে লীন বা মিলিত হওয়া যায়। এইজন্য ইহার নাম যোগ। বাস্তবিক যোগ ব্যতিরেকে মুক্তিলাভের উপায় নাই। মানুষ যে পুনঃ পুনঃ জন্মযন্ত্রণা ভোগ করে, কাম ক্রোধাদি ত্যাগপূর্ব্বক আত্মশুদ্ধ না হওয়াই তাহার একমাত্র হেতু। মনীষিগণ নির্দ্দেশ করেন, কাম ক্রোধ ত্যাগ না হইলে, মনুষ্যের পর পশুজন্ম প্রাপ্তি হয়। এবং অন্তরা বিবিধ নরকভোগ হইয়া থাকে।

দেখুন, যাহারা স্বভাবতঃ ক্রোধপরায়ণ, তাহাদের সহিত সিংহ ব্যাঘ্রাদি পশুর কোনপ্রকার প্রভেদ নাই। পশুগণ যেরূপ ক্রুদ্ধ হইলে, আঘাতাদি করে, রুষ্ট ব্যক্তিরাও তদ্রূপ করিয়া থাকে। ক্রোধের পরিণাম আত্মভ্রংশ। আত্মভ্রংশের পরিণাম পরলোকভ্রংশ। এবং পরলোকভ্রংশের পরিণাম পশুভাব। চতুষ্পদ হইলেই, পশু বলে না। পশুর কার্য্য করিলেই পশু বলে। পশুর প্রধান লক্ষণ পূর্ব্বাপর-পরিশূন্যতা। মানুষ যদি পূর্ব্বাপরপরিশূন্য হয়, তাহা হইলে, তাহাকে পশুভিন্ন আর কি বলা যাইতে পারে?

অগস্ত্য কহিলেন, যোগের কতপ্রকার অবস্থা?

উলূপী কহিলেন, আত্মবিদ্ পুরুষগণ যোগের বহুবিধ শাখা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আমি একে একে তৎসমস্ত বলিতেছি, শ্রবণ করুন। প্রথম, আত্মসংযম; দ্বিতীয় রিপু-জয়; তৃতীয়, দৃশ্যমার্জ্জন; চতুর্থ তত্ত্বজ্ঞান; পঞ্চম, ভক্তি; ষষ্ঠ সত্যনিত্যতা।

অগস্ত্য কহিলেন, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী প্রধান ও সহজসাধ্য?

উলূপী কহিলেন, মনে করিলে, সকলই সহজ; কিছুই কঠিন নহে। একমাত্র মনই সকলের মূল। যে ব্যক্তি যাহাকে যাহা মনে করে, তাহার পক্ষে তাহা তাহাই হইয়া থাকে। রজ্জুকে সর্প বলিয়া মনে করিলে, উহা বাস্তবিকই সর্পবৎ বিভীষিত করিয়া থাকে। কোন কার্য্য কঠিন বলিয়া রাখিয়া দিলে, তাহা আর সম্পন্ন করা সম্ভব নহে। কার্য্য যত কঠিন হউক না কেন, মন থাকিলে, কোন না কোন রূপে

তৎসিদ্ধির সুগম বা সহজ উপায় আবিষ্কৃত হইয়া থাকে।
এই যে দেবতরু অত্যুন্নত মস্তকে গগনমণ্ডল আলোড়ন করিতেছে, ইহা কি এক দিনেই এইপ্রকার উন্নত হইয়াছে? কখনই না। কঠিন ও দুঃসাধ্য কার্য্যমাত্রেই এইরূপ কালকৃত চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইয়া থাকে। আপনার ন্যায়, বহুদর্শী মহর্ষিকে অধিক বলা বাহুল্য।

আত্মরক্ষাবিধিনির্ণয়।

অগস্ত্য কহিলেন, কল্যাণি! কি উপায়ে আত্মাকে রোগ হইতে, শোক হইতে সর্প হইতে, ব্যাঘ্র হইতে, মৃত্যু হইতে, শত্রু হইতে, বিবিধ বিঘ্ন হইতে, ফলতঃ সর্ব্বপ্রকার বিপত্তি হইতে বিনা ব্যয়ে, বিনা আয়াসে, বিনা মন্ত্রে ও বিনা ঔষধে রক্ষা করিতে পারা যায়?

উলূপী কহিলেন, ভগবন্! জগৎপতি পরমাত্মা মানুষকে কখনও অসুখের জন্য ও বিপদের জন্য সৃষ্টি করেন নাই। মানুষ কেবল নিজের বুদ্ধিদোষেই অসুখী ও বিপন্ন হইয়া থাকে। অনবরত বিষয়সেবা করিলে, রোগ ও শোক উভয়ই আক্রমণ ও অবসাদ সংঘটিত করে। ঋষিগণ পরমার্থ সাধনপ্রসঙ্গে দিন-রাত্রি জাগরণে অতিবাহিত করেন, তজ্জন্য তাঁহারা কখনও অবসন্ন বা ভগ্নভাবাপন্ন হন না। কিন্তু মনুষ্য স্ত্রীসেবা বা যাত্রাদি মহোৎসব উপলক্ষে একরাত্রি জাগরণ করিলেও, একান্ত অবসন্ন হইয়া উঠে। ঋষিগণ শত শত দিন অনায়াসে অনশনে যাপন করেন; বিষয়ী এক দিন উপবাসেই কণ্ঠাগত প্রাণ ও ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে।

ফলতঃ, বিষয়ই মানুষের শত্রু। যাহার শরীরে বিষয়-

স্পৃহার সমাবেশ এবং তজ্জন্য হিংসা, দ্বেষ ও ঈর্ষাদির লেশ নাই, সংসারে তাহার কোনপ্রকার শত্রু নাই। সে ব্যক্তি সর্প হইতে, ব্যাঘ্র হইতে, অগ্নি হইতে ও বিষ হইতে কখনও কোনপ্রকার ভয় বা বিপদ প্রাপ্ত হয় না। ঋষিগণ এবিষয়ের দৃষ্টান্ত। ভগবন্! আমি যাহা বলিলাম, ইহারই নাম আত্মকবচ বা সর্ব্বরক্ষাকবচ অথবা প্রকৃত মণিমন্ত্রমহৌষধ। এই কবচ ধারণ করিলে মানুষমাত্রেই রোগ হইতে, শোক হইতে, মোহ হইতে, সর্প হইতে, বৃশ্চিক হইতে, ব্যাঘ্র হইতে, বিষ হইতে, অগ্নি হইতে, শত্রু হইতে, ফলতঃ সর্ব্বপ্রকার আপদ বিপদ ও সংকট হইতে অনায়াসে রক্ষা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বিবিধযোগবর্ণন।

অগস্ত্য কহিলেন, কিরূপ উপায়ে বিলম্বে ও কিরূপ উপায়ে অবিলম্বেই সিদ্ধিলাভ হয়!

উলূপী কহিলেন, ভগবন্! সিদ্ধিলাভের শত শত পন্থা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ঐ পন্থা সাত্বিক ও তামসিক ভেদে দ্বিবিধ। তন্মধ্যে সাত্বিক পন্থাই অবিলম্বিনী সিদ্ধি সাধন সমাহিত করে। তামসিক পন্থায় বহুকালে সিদ্ধ হওয়া যায়।

অগস্ত্য কহিলেন, সাত্বিক পন্থা কাহাকে বলে?

উলূপী কহিলেন, জ্ঞান, বিজ্ঞান, বৈরাগ্য, তিতিক্ষা, উপরতি, ধ্যান ধারণ, সমাধি, সমাহার, প্রত্যাহার, নিবেদন, ভক্তি, প্রেম, শ্রদ্ধা, সমদর্শিতা ইত্যাদির নাম সাত্বিক পন্থা।

অগস্ত্য কহিলেন, তামসিক পন্থা কাহাকে বলে?

উলপী কহিলেন, পূরক, কুম্ভক, রেচক ইত্যাদির নাম

তামসিক পন্থা। এই তামসিক পন্থা যথাবিধি অনুসৃত বা ব্যবহিত না হইলে, শ্বাস, মূর্চ্ছা, উন্মাদ, ক্ষয়, প্রমাদ ও অবসাদ প্রভৃতি বিবিধ রোগ ও ব্যাধির কারণ হইয়া থাকে। যাহাদের মনের তেজ বা পুরুষত্ব নাই, তাহারাই তামসিক পন্থার অনুসারী হয়।

ব্রহ্মজ্ঞাননিরূপণ।

অগস্ত্য কহিলেন, কিরূপে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়?

উলূপী কহিলেন, এবিষয়ে কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ নামে যে বিচিত্র ইতিহাস প্রচলিত আছে, তাহাই বলিতেছি, অবধান করুন।

একদা মহাভাগ অর্জ্জুন জ্ঞানপ্রাপ্তি কামনায় ভগবান্ বাসুদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন,হে কেশব! যাঁহাকে জানিলে তৎক্ষণাৎ মুক্তিলাভ হয়, সেই ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান উপদেশ করুন। সেই ব্রহ্ম স্বগত, সজাতীয় ও বিজাতীয় এই তিন-প্রকার ভেদপরিশূন্য; সর্ব্বপ্রকার উপাধি বর্জ্জিত এবং ক্ষিতি, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, শব্দ, স্পর্শ, রস, গন্ধ, রূপ শ্রোত্র, ত্বক্. চক্ষু, জিহ্বা, ঘ্রাণ, বাক্, পাণি, পায়ু, উপস্থ, মন, বুদ্ধি, প্রকৃতি ও অহঙ্কার এই চতুর্ব্বিংশতি তত্ত্বের অতীত। তাঁহার অবিদ্যাজনিত কোনপ্রকার মলিনতা নাই। এইজন্য তাঁহাকে নিরঞ্জন বলে। তাঁহাকে কোনপ্রকার তর্ক দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। মন তাঁহাকে জানিতে গিয়া প্রতি-নিবৃত্ত হয়। তাঁহার বিনাশ নাই ও উৎপত্তি নাই। শ্রুতিতে তাঁহাকে কৈবল্য ও কেবলস্বরূপ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তিনি শান্তিগুণের আধার ও সর্ব্বপ্রকার কলুষ বহি-

ভূত এবং অত্যন্ত নির্ম্মলস্বরূপ। তাঁহা হইতে সমুদায় উৎপন্ন হইয়াছে, এইজন্য তাঁহাকে কারণ বলে। এইরূপে তিনি সকলের কারণ হইলেও, কোন বস্তুর সহিত সম্বদ্ধ বা কিছুতেই লিপ্ত নহেন। তাঁহার কোন কারণ বা সাধন নাই; তিনিই এই দৃশ্যমান প্রপঞ্চের একমাত্র হেতু ও সাধন। তিনি অন্তর্যামী আত্মা রূপে সকল জীবের হৃদয়-পদ্মে নিত্য বিরাজ করেন। তিনি জ্ঞান ও জ্ঞেয় উভয়-স্বরূপ। অর্থাৎ তিনিই বিষয়রূপে বিষয় সকলের প্রকাশ করেন। তিনি ভিন্ন সংসারে যেমন কোন বিষয়ই নাই, তেমনি তিনি ভিন্ন বিষয়েরও প্রকাশ হয় না।

অর্জ্জুনের এবম্বিধ জ্ঞানগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়া, ভগবান্ হরি বলিতে লাগিলেন, অয়ি মহাবাহু পাণ্ডুনন্দন! তুমি অতি বুদ্ধিমান এবং অতি উৎকৃষ্ট প্রশ্ন করিয়াছ। যেহেতু, বিশিষ্টরূপে তত্ত্বার্থপরিজ্ঞানে তোমার ঔৎসুক্য হইয়াছে। আমি প্রসন্ন হৃদয়ে বিস্তারপূর্ব্বক তদ্বিষয়ের উপদেশ করি-তেছি, মনোযোগসহকারে শ্রবণ কর।

প্রণবাত্মক মন্ত্র ও সেই মন্ত্রের তাৎপর্য্য বিষয় পরমাত্মা, এই উভয়ের সমন্বয়বশে আত্মতত্ত্বের বিচাররূপ যোগ দ্বারা যাঁহারা কামাদি দুর্জ্জয় রিপুদিগকে জয় করিয়া, অহঙ্কারের হস্ত পরিহার করিয়াছেন, তাঁহারা তত্ত্বমসি এই মহাবাক্য আশ্রয় করিয়া, মায়োপাধিক পরব্রহ্মের সহিত অবিদ্যো-পাধিক জীবের ঐক্যরূপ যে অপরোক্ষ জ্ঞান অনুভব করেন, তাহাই ব্রহ্মশব্দে অভিহিত হয়েন। এই ব্রহ্মই ভাবনার একমাত্র বিষয়। এইজন্য শ্রুতি প্রভৃতিতে তাঁহাকে সাক্ষাৎ

সম্বন্ধে ভাবনাশব্দে উল্লিখিত করিয়াছেন। কেহ কেহ নির্দ্দেশ করেন, যোগবলে জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে পরস্পর একীভূত করিয়া, সকল বন্ধনের মূল কামনা গত হইলে, যিনি সেই মুক্ত অবস্থায় একমাত্র ভাবনার বিষয় বা লক্ষ্য হয়েন, তাঁহাকে ব্রহ্ম কহে।

জীব আপনার অবধিভূত পরব্রহ্মস্বরূপ প্রাপ্ত হইলেই, তাহার জ্ঞানের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্তি হইয়া থাকে। যিনি পরব্রহ্ম ও নশ্বর জীব এই উভয়ের সাক্ষীরূপে নিত্য বিরাজমান, তাঁহাকেই কূটস্থ চৈতন্যরূপী অক্ষয় পুরুষ বলে। জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন হইলে সেই অক্ষয়পুরুষকে প্রাপ্ত হইয়া, জন্মমৃত্যুর হস্ত অতিক্রম করিতে পারা যায়।

ক, অক ও ঈ এই তিনটী শব্দের যোগে কাকীপদ সিদ্ধ হইয়াছে। তন্মধ্যে ক শব্দের অর্থ সুখ, অকশব্দের অর্থ দুঃখ এবং ঈ শব্দের অর্থ তদ্‌বিশিষ্ট। এইপ্রকার অর্থ করিলে, কাকীশব্দে সুখদুঃখশালী জীবকে বুঝাইয়া থাকে। এই কাকীশব্দের আদিস্থ ককারের পর যে অকার, তাহাই ব্রহ্মের চেতনাকৃতি মূলপ্রকৃতি। ঐ অকারের লোপ হইলে, যে সুখমাত্রস্বরূপ ককার অবশিষ্ট থাকে, তাহাই অখণ্ড, অদ্বিতীয় মহানন্দস্বরূপ ব্রহ্ম। জীবন্মুক্ত পুরুষ ঐ সুখস্বরূপ ককার বর্ণের প্রতিপাদনে বা বিশিষ্টরূপে পরিজ্ঞানে সযত্ন হইবে। কেননা, নির্ব্বাণসুখ একমাত্র উহাতেই সন্নিহিত। কোন কোন মতে, ক এই বর্ণের অন্তস্থিত অকাররূপ মূলপ্রকৃতির বিলোপ হইলে, ককারান্তরূপ একমাত্র সৎস্বরূপ আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম অবশিষ্ট হয়েন। যে ব্যক্তি মূলপ্রকৃতির

প্রতিপাদ্য ঐ ব্রহ্মের অনুসন্ধান করেন, তিনি তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।

কি গমন, কি অবস্থান, সকল সময়েই প্রাণবায়ুকে দেহ-মধ্যে ধারণ করিয়া, প্রাণায়ামপরায়ণ হইবে। সর্ব্বকাল এইপ্রকার প্রাণায়াম অভ্যাস করিলে, লোকে সহস্রবৎসর বাঁচিয়া থাকে। তথাহি স্বরোদয় শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে যে, মানব শরীর মধ্যে যে দ্বাদশাঙ্গুলি নিশ্বাস প্রবেশ করে, তন্মধ্যে নবমাঙ্গুলি বায়ু দেহাভ্যন্তরে ধারণ করিয়া রাখিতে পারিলে, আর মৃত্যু হয় না।

গ্রহ নক্ষত্রাদি সম্পন্ন এই দৃশ্যমান আকাশের যতদূর দেখিতে পাওয়া যায়, ততদূর পর্য্যন্ত ব্রহ্মাণ্ডকে সেই বিশ্ব-ব্যাপী ব্রহ্মরূপে চিন্তা করিবে। অনন্তর আত্মাকে আকাশে ও আকাশকে আত্মা মধ্যে স্থাপন করিবে। এইরূপে আত্মা ও আকাশ একীভূত হইলে, আর কিছুই চিন্তা করিবে না। ইহাই প্রাণায়ামপরায়ণ ব্যক্তির একমাত্র কর্ত্তব্য। কেননা, যাবৎ, আমি তুমি ইত্যাদি দৃশ্য বস্তুর মার্জ্জনা না হইবে, তাবৎ ব্রহ্মপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নাই। ইহার যুক্তি ও কারণ সুস্পষ্ট। অর্থাৎ কোন ব্যক্তিকে দেখিবার সময়ে যদি অন্য কোন বস্তু অন্তরাল হয়, তাহা হইলে সেই বস্তুকে আর দেখিতে পাওয়া যায় না।

ব্রহ্মজ্ঞানী উল্লিখিত রূপে নির্ব্বিকল্প সমাধিযোগে ব্রহ্ম-স্বরূপে অবস্থান পূর্ব্বক স্থিরবুদ্ধি ও অজ্ঞানবিরহিত হইয়া, যাহাতে শ্বাসবায়ুর লয় হইয়া থাকে। সেই নাসাগ্রের বহিরাকাশ ও অন্তরাকাশ এই উভয় স্থানে অখণ্ড ও অদ্বিতীয়

ব্রহ্ম বিরাজ করিতেছেন, জানিতে পারেন। নির্ব্বিকল্প সমাধির ফলই এই। এই সমাধি সময়ে মনের অবস্থা, বায়ু-শূন্য প্রদেশস্থিত প্রদীপের ন্যায় একান্ত স্থির ও শান্তভাবে পরিণত হয়। তখন আর মানুষকে সংসারদোষদর্শনপূর্ব্বক তাহাতে পদেপদেই লিপ্ত হইয়া ব্যাকুল হইতে হয় না। কেহ কেহ ইহাকে যোগসিদ্ধি বলিয়া থাকেন।

হে অর্জ্জুন! বায়ু নাসাপুটদ্বয় হইতে সর্ব্বতোভাবে বিমুক্ত হইয়া, যে স্থানে লয় প্রাপ্ত হয়, মনকে সেই হৃদয় মধ্যে সন্নিহিত করিয়া পরব্রহ্মরূপী ঈশ্বরের চিন্তা করিবে। ইহাই জ্ঞানযোগসহকৃত ধ্যানযোগের প্রকৃত লক্ষণ। ফলতঃ, সমাধিসময়ে ধ্যাতা ও ধ্যান বিস্মৃত না হইলে, মন আমিষে বড়িশবৎ, ধ্যেয় পদার্থে সংযুক্ত হয় না।

কামক্রোধাদি ছয় রিপু অথবা বাল্য যৌবনাদি ছয় অবস্থাকে উর্ম্মি বলে। পরব্রহ্ম এই ছয় উর্ম্মি অতিক্রম করিয়া বিরাজ করিতেছেন। তিনি নির্ম্মল, নিশ্চল ও সকল মঙ্গল-স্বরূপ এবং তিনি প্রভাশূন্য,মনশূন্য, বুদ্ধিশূন্য ও আময়শূন্য। এইপ্রকার হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহাকে ধ্যান করিবে।

এইরূপ ধ্যানযোগ সহকারে লোকে যখন বিষয়াদি সর্ব্বশূন্য ও আভাসশূন্য হইয়া, নির্ব্বাত প্রদীপের ন্যায়, স্থির শান্ত নিশ্চলভাব অবলম্বন পূর্ব্বক জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর স্বরূপে অবস্থান করে, তাঁহার সেই অবস্থাকে সমাধিস্থ পুরুষের লক্ষণ বলিয়া জ্ঞান করিবে। যিনি এইপ্রকার সমাধিবশে স্থির-বুদ্ধি ও স্থিরজ্ঞান হইয়া, ঈশ্বরকে গুণত্রয়ের অতীত বা তুরীয় চৈতন্যরূপে অবগত হয়েন, তাঁহারই মুক্তিলাভ হইয়া

থাকে। ফলতঃ, যে ব্যক্তির যেপ্রকার স্বভাব, সেইরূপ স্বভাব বিশিষ্ট না হইলে, কখনই তাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায় না।

সমাধি সময়ে চৈতন্য জ্যোতিঃ কর্ত্তৃক পরিচালিত মায়া-চক্রের ভ্রমণবশে স্বীয় দেহ ঊর্দ্ধাধোভাবে ঈষৎ আন্দোলিত হইলেও, সমাধিপর ব্যক্তি ঈশ্বরকে নিশ্চল বলিয়া জ্ঞান করিবেন। ইহাই প্রকৃত সমাধিস্থের লক্ষণ।

যিনি বিচারবলে সর্ব্বথা পর্য্যালোচনাপূর্ব্বক জানিতে পারিয়াছেন, যে, পরমাত্মা ওঁ শব্দের লক্ষ্য হ্রস্ব দীর্ঘ ও প্লুতাদি স্বরব্যঞ্জনশব্দময় পঞ্চাশৎ বর্ণের অতীত এবং অনুস্বার ও কণ্ঠাদি স্থানোদ্ভূতধ্বনি ও নাদৈকদেশ এই তিনেরও বহির্ভূত, তিনিই সমুদায় বেদের তাৎপর্য্য বিশেষরূপে বুঝিয়াছেন।

আমিই ব্রহ্ম, অথবা যিনি সত্যস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ ও অনন্তস্বরূপ, তিনিই ব্রহ্ম, ইত্যাদি মহাবাক্য জনিত অপরোক্ষ জ্ঞান সদ্গুরুর প্রদত্ত সদুপদেশ বলে লাভ করিয়া, যাহার অনুভবাত্মক জ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে, যিনি সুস্পষ্ট জানিতে পারিয়াছেন যে, সমস্ত বেদান্তের তাৎপর্য্যস্বরূপ সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা হৃদয়কমধ্যে অধিষ্ঠিত আছেন এবং কামাদি রিপু সকলের পরাজয় ও হৃদয়গ্রন্থির ছেদন প্রযুক্ত যাঁহার পরমপদ শান্তিপদ প্রাপ্তি হইয়াছে, সেই শান্তশুদ্ধ নির্ম্মলচিত্ত যোগীর আর যোগধারণাদি কোনরূপ সাধনানুষ্ঠানের আবশ্যকতা নাই। কেননা, কার্য্যফল সিদ্ধ হইলে, কারণের প্রয়োজন পরিহৃত হইয়া যায়।

বেদের আদিতে, অন্তে ও মধ্যে যে ওঁকারময় স্বর

উল্লিখিত হইয়াছে, যিনি সেই প্রকৃতি সংযুক্ত প্রণব হইতে শ্রেষ্ঠ, সেই অপরোক্ষ তত্ত্বজ্ঞানীই ঈশ্বর স্বরূপে বিরাজ করেন।

আত্মসাক্ষাৎকারের পূর্ব্বে যে সকল সাধনানুষ্ঠান অবশ্য-করণীয় হইয়া থাকে, আত্মতত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হইলে, সে সকলে আর কিছুমাত্র আবশ্যকতা হয় না। তথাহি, লোকে যাবৎ নদীপারের উপায় না করে, তাবৎ তাহার নৌকা-প্রাপ্তি প্রয়োজন হইয়া থাকে; কিন্তু নদীপারে গমন করিলে, আর তাহার নৌকাতে কোন প্রয়োজন থাকে না। সেইরূপ জীব যাবৎ আত্মজ্ঞান লাভে সমর্থ না হয়, তাবৎ তাহার প্রাণায়াম, ধ্যান ও ধারণাদি বিবিধ যোগচর্চ্চার আব-শ্যকতা হইয়া থাকে, কিন্তু আত্মার সাক্ষাৎকার সংঘটিত হইলে, আর তাহার ঐ সকলে কোনপ্রকার প্রয়োজনই লক্ষিত হয় না।

পুনশ্চ, ধান্যার্থী যেমন পলাল মর্দ্দন পূর্ব্বক ধান্য সংগ্রহ করিয়া, তৃণসকলকে দূরে বিসর্জ্জন করে, ধীমান পুরুষ তেমনি বিবিধ শাস্ত্র সমালোচন পূর্ব্বক জ্ঞানবিজ্ঞানতৎপর হইয়া, অবশেষে সেই শাস্ত্র সকল পরিত্যাগ করিবেন।

অন্ধকার রাত্রিতে কোন দ্রব্যের অন্বেষণ জন্য লোকে যেমন উল্কা গ্রহণ করিয়া থাকে, এবং সেই অভিলষিত বস্তু দর্শন হইলে,তৎক্ষণাৎ সেই উল্কা ত্যাগ করে, তদ্রূপ অবিদ্যারূপ নিবিড় তিমিরে আচ্ছন্ন এই সংসারসঙ্গতিরূপ রজনীতে পরমার্থদর্শনে অভিলাষী পুরুষ জ্ঞানরূপ উল্কা সাহায্যে পরমজ্ঞেয়স্বরূপ সেই সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাকে

দর্শন করিয়া, যোগাভ্যাসাদি জ্ঞানসাধন সকলও পরিত্যাগ করিবেন।

যে ব্যক্তি অমৃত পান করিয়া, পরিতৃপ্ত হইয়াছে, তাহার যেমন দুগ্ধে প্রয়োজন হয় না, সেইরূপ, যে ব্যক্তি জ্ঞানালোক সহায়ে পরমজ্ঞেয়রূপী পরাৎপর ব্রহ্ম বস্তুকে প্রত্যক্ষ করিয়া, নির্ম্মল আনন্দ লাভে পরিতৃপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার আবার বেদাদিশাস্ত্রের আলোচনায় প্রয়োজন কি ?

জ্ঞানরূপ অমৃত, পান করিয়া যাঁহার পরিতৃপ্তি জন্মিয়াছে, তাদৃশ কৃতকৃত্য যোগির আর কিছুরই অনুষ্ঠান করিতে হয় না। কেননা, স্বদেহের ভোগদৃষ্টির ন্যায়, সাক্ষী চৈতন্য সহায়ে সকল দেহের ভোগদৃষ্টি থাকাতে, তত্ত্বজ্ঞানীর সকল সুখই সম্পন্ন হইয়া থাকে। যদিও লোক সংগ্রহার্থ তিনি কর্ম্মবিশেষের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েন; কিন্তু অভিনিবেশ সহকারে তত্তৎ কর্ম্ম সম্পাদন করিলে, তিনি তত্ত্বজ্ঞানী বলিয়া, পরিগণিত হইতে পারেন না। ফলতঃ জ্ঞেয়স্বরূপ পরমাত্মাকে জানিলে, যেমন সকল জানা হয়, সেইরূপ তাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কেননা, সংসারের যাহা কিছু সমুদায়ই তিনি। তিনি ভিন্ন আর কিছুই নাই। যে ব্যক্তি ইহা জানিয়াছেন, তিনিই প্রকৃত জানিয়াছেন। সুতরাং তিনিই প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞানী।

পরম বস্তু পরব্রহ্ম একমাত্র প্রণব সহায়ে পরিজ্ঞাত হয়েন। তৈলধারা ও দীর্ঘ ঘণ্টাশব্দের যেমন বিচ্ছেদ নাই তিনিও তেমনি বিচ্ছেদহীন বা অখণ্ডিত। তাঁহাকে বাক্য

দ্বারা ও মন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না। যিনি এইপ্রকার অবধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তিনিই সকল বেদের প্রকৃত তাৎপর্য্য বা যথার্থ মর্ম্ম পরিগ্রহ করিয়াছেন। ফলতঃ, বেদপ্রতিপাদ্য পরমাত্মাকে প্রকৃত রূপে পরিজ্ঞাত করিয়া, হৃদয়ে ধারণ করাই বেদপাঠের একমাত্র কার্য্য ও ফল। যিনি এইপ্রকার করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ বেদজ্ঞ বা প্রকৃত বৈদিক।

যিনি আত্মাকে অরণি (অর্থাৎ অগ্ন্যুৎপাদক কাষ্ঠ) ও প্রণবকে অপর অরণি করিয়া, ধ্যানরূপ নির্ম্মথন অভ্যাস করেন, তিনি তদ্দ্বারা নিগূঢ় ব্রহ্মাগ্নি দর্শন করিয়া থাকেন। অর্থাৎ যাহা দ্বারা অগ্নি উৎপাদিত হয়, ঐরূপ দুইখান কাষ্ঠকে পরস্পর মন্থন অর্থাৎ ঘর্ষণ করিলে, যেরূপ সেই ঘর্ষণ বশে কাষ্ঠমধ্যে লুকায়িত অগ্নি তৎক্ষণাৎ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে, তদ্রূপ জীবাত্মা ও প্রণব উভয়কে একযোগে গ্রহণ বা ধারণ করিয়া, বারংবার ধ্যান করিলে, অতীব গূঢ় স্বরূপ পরমাত্মার সাক্ষাৎকারপ্রাপ্তি হয়। সমুদায় বেদের একমাত্র উদ্দেশ্য, পরমার্থ প্রতিপাদন করা। প্রণবই বেদের মূল ভাগ। সেই মূল ভাগ পর্য্যালোচনা করিলে, অবশ্যই পরমাত্ম সিদ্ধলাভ হইবে, তাহাতে সন্দেহ কি? এক ব্যক্তি বহুদিন বা যাবজ্জীবন তদাদি তদন্তক্রমে বেদাদি সকল শাস্ত্রপাঠ করিল, কিন্তু তাহার কিছুই হইল না। ইহার কারণ কি? উত্তর, সে ব্যক্তি প্রকৃততাৎপর্য্যপর্য্যালোচনাপূর্ব্বক কখনই পরব্রহ্মপ্রতিপাদক তত্তৎ শাস্ত্র অভ্যাস করে নাই। এইজন্য তাহার পরমার্থপরিজ্ঞানসিদ্ধিও সংঘটিত হয় নাই।

হে অর্জ্জুন! পরমাত্মা, নির্ধূম পাবকের ন্যায়, নিতান্ত প্রকাশ সম্পন্ন। যাবৎ তাঁহাকে দেখিতে না পাইবে, তাবৎ অনন্য চিত্তে তাদৃশ পরমরূপ ধ্যান করিবে। দেখ, মন চক্রের ন্যায় নিরন্তর ইতস্ততঃ পরিক্রমণ করিতেছে। অস্থির জলে যেমন চন্দ্রবিম্ব প্রতিফলিত হয় না, চঞ্চল চিত্তে তেমনি পরমাত্মবিম্ব প্রতিভাত হয় না। এই জন্য মনকে বিষয় হইতে প্রত্যাহরণ করিয়া, আমিষে বড়িশবৎ ধ্যেয় পদার্থে সংসক্ত করিবে। ইহারই নাম একাগ্রতা। একাগ্রতা সিদ্ধি না হইলে,সংসারের কোন বিষয়ই সাধন করা যায় না; পরমাত্মসাধনরূপ অতি দুরূহ বিষয়ের কথা আর কি বলিব?

হে অর্জ্জুন! জীবাত্মা পরমাত্মা হইতে দূরস্থ হইলেও, দূরস্থনহেন। কেননা,জীবাত্মা ও পরমাত্মা এই উভয়ে কোনরূপ প্রভেদ নাই। পুত্র যেমন পিতার প্রতিবিম্ব,জীবাত্মা ও পরমাত্মাতেও সেইপ্রকার বিম্ব-প্রতিবিম্ব-সম্বন্ধ। আবার, পদ্মপত্রস্থ জল যেমন পদ্মপত্রে সংলগ্ন হয় না,জীবাত্মা তেমনি পাঞ্চ ভৌতিক শরীরেবঅস্থিতি করিলে, কদাচ সেই শরীরে সম্বদ্ধ বা লিপ্ত নহেন। এই দৃশ্যমান দেহ তাঁহার অস্থায়ী আবরণ মাত্র। লোকে যেমন পুরাণ বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া নূতন বস্ত্র পরিধান করে,জীবাত্মা তেমনি জীর্ণ দেহ পরিহার পুরঃসর নবীন দেহে অনুপ্রবিষ্ট হয়েন। সুতরাং, তিনি কোনমতেই এই দেহে লিপ্ত নহেন। এই জন্য শ্রুতি প্রভৃতি বিজ্ঞান শাস্ত্রসমূহে তাঁহাকে মহাকাশ রূপে বর্ণনা করিয়াছেন। তথাহি, আকাশ সর্ব্বত্রই লক্ষিত হয়,কিন্তু কোন পদার্থেই সংবদ্ধ বা

সংলগ্ন নহে। জীবাত্মাও তদ্রূপভাবাপন্ন। পুনশ্চ,এই জীবাত্মা নিত্য, নির্ম্মল, সর্ব্বব্যাপী ও সর্ব্বপ্রকার মালিন্য পরিশূন্য। তত্ত্বজ্ঞানলাভ হইলেই, জীবাত্মা পরমাত্মার সহিত যে অভেদ ভাবে মিলিত হয়েন, ইহাই তাহার কারণ। অথবা, জল জলের সহিত মিলিত হইবে, তাহাতে বিস্ময় কি ?।

হে অর্জ্জুন ! জীবাত্মা দেহস্থ হইলেও, দেহস্থ নহেন। লোকে অজ্ঞান বশতই ঐ প্রকার কল্পনা করে। সংসারে ইহার দৃষ্টান্ত বিরল নহে। নৌকাপথে গমনাগমন সময়ে ব্যক্তিমাত্রেরই মনে হয়, তীরস্থ বৃক্ষাদি চলিতেছে। কিন্তু তাহা কখনই নহে। অজ্ঞান বশতই তাদৃশ কল্পনার আবিষ্কার হইয়া থাকে। ফলতঃ যে জ্ঞানে রজ্জুতে সর্পবোধ হয় অথবা শুক্তিতে রজতভ্রম হয় ; সেই অন্ধ জ্ঞানেই জীবাত্মার ঈদৃশ অসার কলেবরের আরোপ হয়। পরমার্থ-বিচারসহকৃত বিবেকসহায়ে সূক্ষ্ম পর্য্যালোচনা করিলে, স্পষ্টই জানিতে পারা যায়,এই দেহ মায়াময়,উহাই আত্মাতে অবস্থিতি করিতেছে। এইরূপ, জীবাত্মা শরীরস্থ হইলেও, জন্মমরণশীল সেই শরীরের ন্যায়, কখনও জন্ম মৃত্যুর বশীভূত হয়েন না। কেন না, তিনি দেহের ন্যায় পঞ্চভূতে বিনির্ম্মিত নহেন। সুতরাং, ভৌতিক পদার্থের ন্যায়, তাঁহার আবির্ভাব বা তিরোভাব নাই। ভূতমাত্রেই অনিত্য, এই জন্য ভূতসমবায়ে নির্ম্মিত দেহ প্রভৃতি পদার্থমাত্রেই অচির-স্থায়ী বা ধ্বংসনশীল।

পুনশ্চ, এই দেহমধ্যে অবস্থিতি করিলেও, জীবাত্মা কিছুই ভোগ করেন না। কেন না, তিনি সুখ দুঃখের

অতীত পরমনির্ম্মলমূর্ত্তি ও পূর্ণ হইতেও পূর্ণ পরমাত্মার প্রকার ভেদমাত্র। শ্রুতি প্রভৃতি এই প্রকারভেদকে প্রতিবিম্ব বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। অন্যান্য তত্ত্বশাস্ত্রে ইহাকে জীবাকাশ বলিয়াছে। ফলতঃ, দেহই ভোগ সাধন উপাদানে নির্ম্মিত। এই বিশ্ব সংসারের যাহা কিছু সুখ দুঃখ, দেহই তাহা ভোগ করিয়া থাকে। ভাবিয়া দেখিলে, সাংসারিক সুখ দুঃখে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই। অর্থাৎ সংসারে যাহাকে সুখ বলে, তাহা দুঃখের নামান্তর মাত্র। কেন না, সুখ যেমন অচিরস্থায়ী, দুঃখও তেমনি ক্ষণিক পদার্থ। যে যে বস্তু এইপ্রকার সমধর্ম্মাক্রান্ত, তাহারা পরস্পর সমান, তাহাতে সন্দেহ কি ? এইপ্রকার বিবেচনা করিলে, ক্ষণিক দেহই প্রকৃত পক্ষে আপনার সমধর্ম্মাক্রান্ত সুখ দুঃখে সম্বদ্ধ; নিত্য নির্ম্মল আনন্দ স্বরূপ আত্মা কখনও তাহাতে লিপ্ত হইতে পারেন না।

পুনশ্চ, রোগ, শোক, পরিতাপ ও বধ প্রভৃতি বিবিধ বন্ধনে দৃঢ়বদ্ধ এই দেহমধ্যে অবস্থিতি করিলেও, আত্মা কখনও বন্ধনগ্রস্ত হয়েন না। কেননা, আত্মা আকাশের ন্যায় নির্লিপ্তমূর্ত্তি। আকাশ অর্থাৎ শূন্য বা অসম্বদ্ধ বস্তুকে কোন রূপে বন্ধন করা সাধ্যায়ত্ত নহে। অজ্ঞেরাই না বুঝিয়া, ও না ভাবিয়া, আত্মাকে বন্ধনপ্রাপ্ত মনে করে। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। (গীতাতে এইজন্য তাঁহাকে অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, অবধ্য ও অদাহ্য প্রভৃতি শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন।)

হে অর্জ্জুন ! তিল মধ্যে তৈলের ন্যায়, ক্ষীরমধ্যে ঘৃতের ন্যায়, পুষ্পমধ্যে গন্ধের ন্যায় এবং ফলমধ্যে রসের ন্যায়

আত্মা দেহমধ্যে বাস করিতেছেন। এইরূপে তিনি সর্ব্বদেহে ব্যবস্থিত আছেন। এইজন্য শ্রুতিতে স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তিনি ভিন্ন কোন বস্তুই নাই। তিনি ভিন্ন যাহা, তাহাই অবস্তু। তিনি ওতপ্রোতভাবে সকল বস্তুতেই অনুপ্রবিষ্ট আছেন।

কাষ্ঠমধ্যে অগ্নি যেমন প্রকাশিত হয়েন, তদ্রূপ দেহিমাত্রেরই মনস্থ আত্মরূপী সেই ঈশ্বর মনোমধ্যে অবস্থানপূর্ব্বক আপনা আপনি প্রকাশ পাইতেছেন। এইজন্য যোগশাস্ত্রে উপদেশ করিয়াছেন, পরমাত্মা সর্ব্বদা সকলের অন্তর্হৃদয়ে বিরাজমান হইতেছেন। যাহারা ইহা না জানে, তাহারাই অতি দূরতীর্থাদির সেবা করিয়া, তাঁহাকে প্রাপ্ত হইবার চেষ্টা করিয়া থাকে। কিন্তু তদ্দ্বারা তাঁহাকে সহজে প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট। কেননা, যে বস্তু অন্তর মধ্যে সন্নিহিত, তাহাকে বাহিরে অন্বেষণ করিলে, কিরূপে পাওয়া যাইতে পারে। ফলতঃ, বায়ু যেমন আকাশে বিচরণ করে, কেহই দেখিতে পায় না, তদ্রূপ তিনি সকলের অদৃশ্য হইয়া, হৃদয়রূপ আকাশে নিরন্তর বিচরণ করিতেছেন। এইজন্য প্রকৃততত্ত্বপরিজ্ঞানী যোগীগণ অন্যচিন্তাপরিহারপূর্ব্বক সর্ব্বক্রিয়াবিহীন হইয়া, অনন্য বুদ্ধিতে তাঁহাকে হৃদয়গুহায় অন্বেষণ করেন এবং তীর্থ প্রভৃতি ক্রিয়াযোগে আসক্ত পুরুষ অপেক্ষা আশু পরমাত্মসাক্ষাৎকাররূপ চরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন।

যিনি মনে ও মনোমধ্যে অবস্থিতি করেন এবং মনস্থ হইয়াও যিনি মনের ধর্ম্ম সংকল্প ও বিকল্পাদির বিষয়ীভূত

নহেন, যোগযুক্ত পুরুষগণ সেই সচ্চিদানন্দরূপী পরাৎপর ঈশ্বরকে মনের দ্বারা মনোমধ্যে অবলোকন করিয়া, স্বয়ং সিদ্ধ হইয়া থাকেন। বাস্তবিক, মন সহায় না হইলে, পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া দুর্ঘট। মনের দোষেই লোকের পরমার্থপদারোহণের সম্পূর্ণ ব্যাঘাত ঘটিয়া থাকে। এই জন্য যত্নপূর্ব্বক মনকে বশীভূত করিবে। যে ব্যক্তি অজিতচিত্ত হইয়া পরমেশ্বরের প্রাপ্তিরূপ চরম সিদ্ধিলাভে সমুদ্যত হয়, সে গলদেশে প্রস্তরবন্ধনপূর্ব্বক নদীপারগমনের চেষ্টা করিয়া থাকে,সন্দেহ নাই। এই মন স্বভাবতঃ কুলালচক্রের ন্যায় অনবরত ভ্রমণ করিতেছে। ইহাকে আয়ত্ত করাই ঈশ্বরসিদ্ধির প্রথম সোপান।

সঙ্কল্প ও বিকল্প ইত্যাদি মনের ধর্ম্ম। এই সঙ্কল্প বিকল্প হইতেই বিবিধ বিষয়সংগ্রহ ও তজ্জন্য পরমার্থজ্ঞানপ্রাপ্তির মূর্ত্তিমান মহাবিঘ্ন অজ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি এই মনকে উল্লিখিত সংকল্পাদি বিরহিত ও আকাশের ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ও নির্লিপ্ত করিতে পারেন, তিনিই নিশ্চয় পরমাত্মাকে জানিতে সমর্থ হয়েন। ইহাই সমাধিস্থের লক্ষণ। (অর্থাৎ যে অবস্থায় অবস্থিত হইলে, মন বাহ্য বিষয় হইতে এক কালেই বিরত ও আকাশের ন্যায়, নির্ম্মল হইয়া পরমাত্মস্বরূপ পর্য্যবলোকন করে, তাহাকেই সমাধি বলে।

হে অর্জ্জুন! যে ব্যক্তি যোগরূপ অমৃত পান ও বায়ু মাত্র ভক্ষণ করিয়া, সর্ব্বদা সুখভোগ করিবার অভিলাষে প্রত্যহ সমাধি অভ্যাস করেন, তিনি কখনও জন্মমরণাদি

রূপ সংসারে পতিত হয়েন না। তাঁহার নির্ব্বাণমুক্তি ও ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হইয়া থাকে।

যাঁহার ঊর্দ্ধ, অধ ও মধ্য সমুদায়ই শূন্য অর্থাৎ যাঁহার উপরে আকাশমাত্র, তাহাতে চন্দ্র সূর্য্য বা গ্রহ নক্ষত্রাদি কিছুই নাই, যাঁহার নিম্নে পৃথিবী প্রভৃতি ভূত বা তাহাদের সমবায়ে বিনির্ম্মিত কোন পদার্থই নাই এবং যাঁহার মধ্য অর্থাৎ দেহাদি নাই, এইরূপে যিনি সর্ব্বশূন্য, তিনিই পরমাত্মা। যিনি পরমাত্মার এই প্রকার স্বরূপ অবধারণ করিয়া, তাঁহাকে চিন্তা করেন, তিনিই প্রকৃত সমাধিস্থ। ইহার নাম নিরবলম্ব সমাধি। এই নিরবলম্ব সমাধিতে আমি তুমি ইত্যাদি দৃশ্যজ্ঞান তিরোহিত ও তৎপ্রভাবে সংসারশান্তি হইয়া নির্ব্বাণ পথ আবিষ্কৃত হয়।

এইরূপ সর্ব্বশূন্যস্বরূপ পরমাত্মার প্রকৃত তত্ত্ব পরিজ্ঞাত হইলে, সমস্ত পুণ্য পাপে পরিহার প্রাপ্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ, বিধি নিষেধাদি শাস্ত্রের করণ অকরণ জন্য কোনপ্রকার ইষ্টানিষ্টের সংঘটন সম্ভাবনা থাকে না।

উলপী কহিলেন, ভগবন্! এই আমি আপনার নিকট কৃষ্ণার্জ্জুন সংবাদ নামক অপূর্ব্ব ইতিহাস কীর্ত্তন করিলাম। আর কি শুনিতে ইচ্ছা হয়, বলুন।

অগস্ত্য কহিলেন, কল্যাণি! তোমার আশীর্ব্বাদে আমার অভিলাষ সিদ্ধ হইয়াছে। আমি চলিলাম। তুমি সুখে থাক।

ইতি শ্রীরোহিণীনন্দন সরকার সঙ্কলিত অগস্ত্য সংহিতা সমাপ্ত।